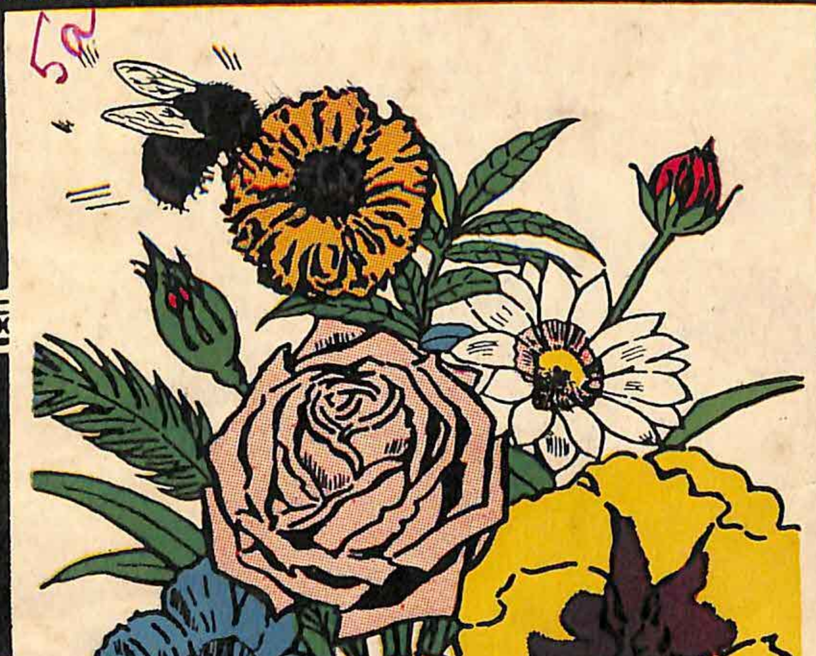
সবুজ পাঠ



এন্, বি, পাবলিশিং

সবুজ পত্র

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Bengali Text Book for Class VII.
[Vide T. B. No. 76/7/T. B. 64 and also Board's Letter No. R. B./76/DS/1 dated 24.12.76].

সবুজ পাঠ

[সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য]

প্রফুল্ল কুমার মাইতি এম. এ. বি.টি.
প্রধান শিক্ষক
গোপালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় (মেদিনীপুর)

সত্যরঞ্জন জানা এম.এ. বি.টি.
প্রধান শিক্ষক
বালিঘাই ফকির দাস মাধ্যমিক বিদ্যালয় (মেদিনীপুর)

এন. বি. পাবলিশিং
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীরঞ্জিত কুমার মহাপাত্র
এন. বি. পাবলিশিং
১১/২ নিলমণি দত্ত লেন
কলিকাতা-১২

প্রথম মুদ্রণ, ১৯৭৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৭৬
তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৭৭
চতুর্থ মুদ্রণ, ১৯৭৮
পঞ্চম মুদ্রণ; ১৯৭৯
ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৯৮০
সপ্তম মুদ্রণ, ১৯৮১
অষ্টম মুদ্রণ, ১৯৮২
নবম মুদ্রণ, ডিসেম্বর ১৯৮৩

প্রাপ্তিস্থান :
শৈলশ্রী লাইব্রেরী
২৩/১ কলেজ রো
কলিকাতা-৯

[ভারত সরকার কর্তৃক স্বল্পমূল্যের কাগজে মুদ্রিত]

মূল্য : ৫ টাকা

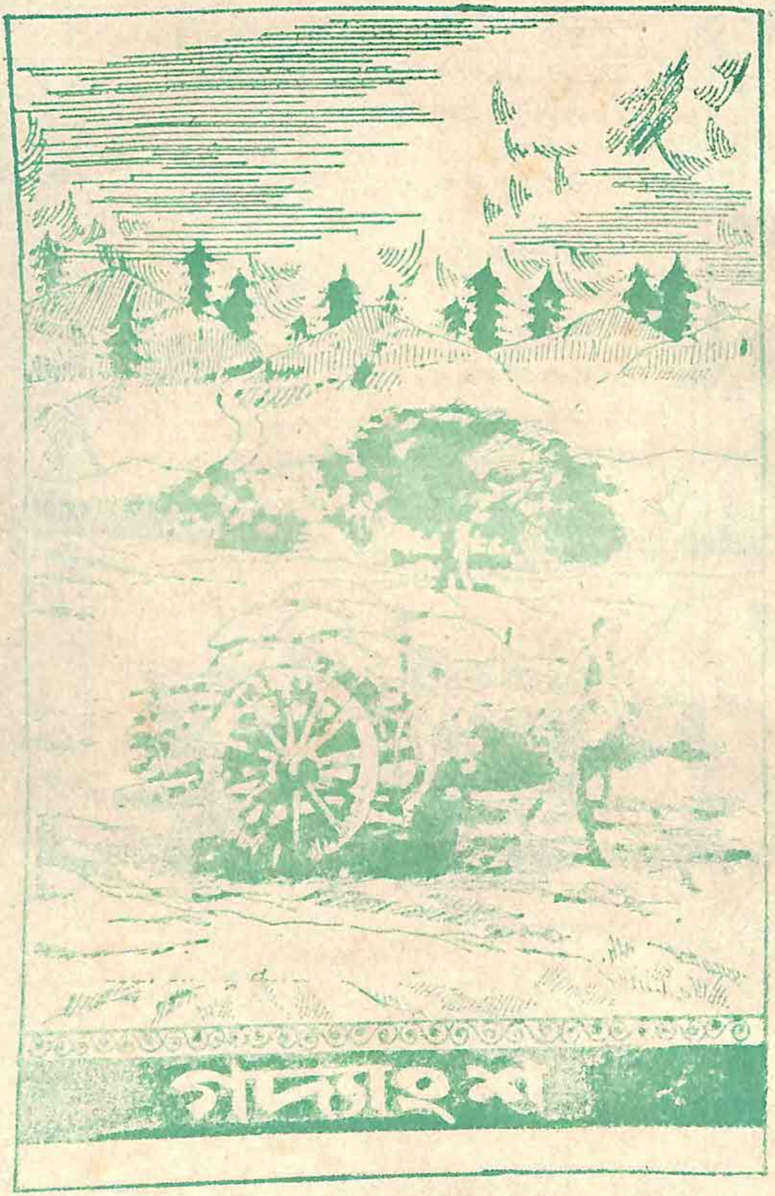
মুদ্রাকর :
শ্রীগণেশ কুমার ভাণ্ডারী
লক্ষ্মী প্রিন্টার্স
২১/১ বি, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

ভূমিকা

সপ্তম শ্রেণীর সিলেবাস অনুসারে 'সবুজ পাঠ' পুস্তকটি সংকলিত ও সম্পাদিত হইয়াছে সুকুমার মতি বালক-বালিকাদের মানসিক গঠন-ভঙ্গীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য লেখক ও কবিদিগের লিখা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও নাট্যাংশ সংযোজিত করা হইয়াছে। নির্দিষ্ট সিলেবাসের সীমিত পরিসরের মধ্যে সংকলন কার্যটি সুসম্পন্ন করিতে গিয়া মূল রচনাটির কোন কোন ক্ষেত্রে সংগীত বজায় পূর্বক কলেবর হ্রাস করা হইয়াছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে পাঠ্যাংশের প্রারম্ভে লেখক—কবি পরিচিতি এবং পরিশেষে বিস্তৃত অনুশীলনী প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও অলংকরণে সৌষ্ঠব সাধন করিয়া এন. বি. পাবলিশিং-এর প্রকাশক শ্রীযুক্ত রঞ্জিত কুমার মহাপাত্র চির-কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। চাঁপাতলা হাই স্কুলের সহ-প্রধান শিক্ষক পুস্তকাটির সংশোধনের গুরু দায়িত্ব বহন করিয়া স্নেহভাজন হইয়াছেন। সবশেষে আশা রাখি এই গ্রন্থখানি সহৃদয় শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের দ্বারা মনোনীত হইলে এবং স্নেহধন্য ছাত্র-ছাত্রীদের ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার সহায়ক হইলে আমাদের শ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থক বলিয়া গণ্য করিব।

বিনীত

গ্রন্থকারদ্বয়





লোভ সংবরণ

ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর

[১৮২০ সালে ২৬শে সেপ্টেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতার নাম ভগবতী দেবী। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে পড়াশুনা শেষ করে মাত্র একুশ বৎসর বয়সে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন। বাংলা বিদ্যাসাগরী ভাষার তিনি প্রবর্তক এবং তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যে সেমি-কোলন এবং পূর্ণচ্ছেদ ইত্যাদি প্রয়োগ করেন। এইসব কারণে তাঁকে 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক' বলা হয়। বাংলাদেশের শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারে তাঁর অবদান অজস্র। 'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলা', 'বোধোদয়,' 'কথামালা', 'ব্যাকরন কৌমুদী' প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। ১৮৯১ সালে ২৯শে জুলাই এই মনীষী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।]

এক দীন বালক কোনও বড়মানুষের বাটীতে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহার উপর গৃহমার্জন প্রভৃতি অতিসামান্য নিকৃষ্ট কর্মের ভার ছিল। সে একদিন গৃহস্বামীর বাসগৃহ পরিষ্কৃত করিতেছে, এবং গৃহমধ্যে সজ্জিত মনোহর দ্রব্যসকল দৃষ্টিগোচর করিয়া, আহ্লাদে পুলকিত হইতেছে। তৎকালে সেই গৃহে অন্য কোনও ব্যক্তি ছিল না ; এজন্য সে নির্ভয়ে এক একটি দ্রব্য হস্তে লইয়া কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া দিতেছে।

গৃহস্বামীর একটি সোনার ঘড়ি ছিল। ঘড়িটি অতি মনোহর,

উত্তম স্বর্ণে নির্মিত, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরকখণ্ডে মণ্ডিত। বালক ঘড়িটি হস্তে লইয়া, উহার অসাধারণ সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বল্য দর্শনে মোহিত হইল; এবং বলিতে লাগিল, যদি আমার এরূপ একটি ঘড়ি থাকিত, তাহা হইলে, কি আহ্লাদের বিষয় হইত। ক্রমে ক্রমে তাহার মনে প্রবল লোভ জন্মিলে, সে ঘড়িটি চুরি করিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বালক সহসা চকিত হইয়া উঠিল, এবং বলিতে লাগিল, যদি আমি লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া এই ঘড়ি লই, তাহা হইলে চোর হইলাম। এখন কেহ গৃহের মধ্যে নাই; এবং আমি চুরি করিলাম বলিয়া জানিতে পারিতেছে না; কিন্তু যদি দৈবাৎ চোর বলিয়া ধরা পড়ি, তাহা হইলে আমার আর দুর্দশার সীমা থাকিবে না। সর্বদা দেখিতে পাই, চোরেরা রাজদণ্ডে যৎপরোনাস্তি শাস্তি ভোগ করিয়া থাকে। আর যদিই আমি চুরি করিয়া মানুষের হাত এড়াইতে পারি, ঈশ্বরের নিকট কখনও পরিত্রাণ পাইতে পারিব না। জননীর নিকট অনেকবার শুনিয়াছি, আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, এবং আমরা যখন যাহা করি, সমুদয় প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

এই বলিতে বলিতে তাহার মুখ ম্লান ও সর্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন সে ঘড়িটি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া বলিতে লাগিল, লোভ করা বড় মন্দ; লোকে লোভ সংবরণ করিতে না পারিলেই, চোর হয়। আমি আর কখনও কোনও বস্তুতে লোভ করিব না; এবং লোভের বশীভূত হইয়া চোর হইব না। চোর হইয়া ধনবান হওয়া অপেক্ষা, ধর্মপথে থাকিয়া নির্ধন হওয়া ভাল; তাহাতে চিরকাল নির্ভয়ে ও মনের সুখে থাকা যায়। চুরি করিতে উদ্যত হইয়া, আমার মনে এত ক্লেশ হইল; চুরি করিলে না জানি, আমি কতই ক্লেশ পাইব। ইহা বলিয়া সেই সুবোধ, সচ্চরিত্র, দরিদ্র বালক পুনরায় গৃহমার্জনে প্রবৃত্ত হইল।

গৃহস্বামিনী ঐ সময়ে পার্শ্ববর্তী গৃহে থাকিয়া বালকের সমস্ত কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে এক পরিচারিণী দ্বারা

আপন সম্মুখে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে বালক, তুমি কিজন্য আমার ঘড়িটি লইলে না ? বালক শুনিবামাত্র হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কোনও উত্তর দিতে পারিল না ; জানু পাতিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বিষণ্ণবদনে, কাতর নয়নে, গৃহস্বামিনীর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ভয়ে তাহার সর্বশরীর কাঁপিতে ও নয়নদ্বয় হইতে বাষ্পবারি নির্গত হইতে লাগিল।

তাহাকে এইরূপ কাতর দেখিয়া, গৃহস্বামিনী সস্নেহবচনে বলিলেন, বৎস, তোমার কোনও ভয় নাই ; তুমি কিজন্য এত কাতর হইতেছ ? এখানে থাকিয়া, আমি তোমার সকল কথা শুনিতে পাইয়াছি ; কিন্তু শুনিয়া তোমার উপর কি পর্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, বলিতে পারি না। তুমি দীনের সন্তান বটে, কিন্তু আমি কখনও তোমার তুল্য সুবোধ ও ধর্মভীরু বালক দেখি নাই। জগদীশ্বর তোমার যে লোভ সংবরণ করিবার এরূপ শক্তি দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে প্রণাম কর ও ধন্যবাদ দাও। অতঃপর সর্বদা এরূপ সাবধান থাকিবে, যেন কখনও লোভের বশীভূত না হও।

এই প্রকারে তাহাকে অভয় প্রদান করিয়া তিনি বলিলেন, শুন বৎস, তুমি যে এরূপে লোভ সংবরণ করিতে পারিয়াছ, তজ্জন্য তোমায় পুরস্কার দেওয়া উচিত. এই বলিয়া, কতিপয় মুদ্রা তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন, অতঃপর তোমায় আর গৃহমার্জন প্রভৃতি নীচকর্ম করিতে হইবে না। তুমি বিদ্যাভ্যাস করিলে, আরও সুবোধ ও সচ্চরিত্র হইতে পারিবে ; এজন্য কল্য অবধি আমি তোমায় বিদ্যালয়ে পাঠাইব, এবং অন্ন, বস্ত্র, পুস্তক প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যক বিষয়ের ব্যয় নির্বাহ করিব। অনন্তর, তিনি হস্তে ধরিয়া তাহাকে উঠাইলেন, এবং তাহার নয়নের অশ্রু মার্জন করিয়া দিলেন।

গৃহস্বামিনীর ঈদৃশ স্নেহবাক্য শ্রবণে ও সদয় ব্যবহার দর্শনে, ঐ দীন বালকের আহ্লাদের সীমা রহিল না। তাহার নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। সে পরদিন অবধি, বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া,যারপর-নাই যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া শিক্ষা করিতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই,

সে বিলক্ষণ বিদ্যোপার্জন করিল ; এবং লোকসমাজে বিদ্বান্ ও ধর্মপরায়ণ বলিয়া গণ্য হইয়া, সুখে ও স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিল।

॥ অনুশীলনী ॥

সাধারণ প্রশ্ন :—

১। বালক কিভাবে লোভ সংবরন করল তা বর্ণনা কর।

২। বালকের সাধুতা দেখে গৃহস্বামিনী তাকে কি বলেছিলেন ?

৩। লোভ সংবরণের জন্য গৃহস্বামিনী বালককে কিভাবে পুরস্কৃত করল তার বিবরণ দাও।

৪। গল্পটি পাঠ করে তুমি কি শিক্ষা পেলে নিজের ভাষার গুছিয়ে লেখ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :—

১। (ক) 'দীন বালক' বড়-মানুষের বাটীতে কি করত ? (খ) "সে ঘড়িটি চুরি করিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হইল।"—'সে' কে ? 'ঘড়িটি' কেমন ছিল ? তার ঘড়ি চুরি করবার ইচ্ছা হ'ল কেন ? (গ) সর্বদা দেখিতে পাই, চোরেরা রাজদণ্ডে যৎপরোনাস্তি শাস্তি ভোগ করিয়া থাকে। বক্তব্যটি কার ? চোর কাকে বলে ? 'রাজদণ্ড' কি ? রাজদণ্ড ভোগকারী কোন চোরের কাহিনী বল। (ঘ) 'ইহা বলিয়া সেই সুবোধ, সচ্চরিত্র, দরিদ্র বালক পুনরায় গৃহমার্জনে প্রবৃত্ত হইল।'—উদ্ধৃতিটি কার ? 'ইহা বলিয়া'—কথাটি কি ? বক্তার সুবোধ গুন ও সচ্চরিত্রতার কি পরিচয় পেয়েছ তার বর্ণনা দাও। (ঙ) 'তুমি দীনের সন্তান বটে, কিন্তু আমি কখনও তোমার তুল্য সুবোধ ও ধর্মভীরু বালক দেখি নাই।'—বক্তা কে ? উক্তিটি কাকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে ? উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সুবোধ গুন ও ধর্মভীরুতার কি পরিচয় পেয়েছ বল।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :—

১। (ক) "আমরা তাঁহাকে দেখিতে·····প্রত্যক্ষ করিতেছেন।"

—উক্তিটি কার ? কে কোন্ প্রসঙ্গে এই কথা স্মরণ করেছে ? তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় না অথচ সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান—দুই পরস্পরবিরোধী যুক্তির ব্যাখ্যা দাও।

(খ) 'চোর হইয়া ধনবান হওয়া ·····সুখে থাকা যায়।'

—উক্তিটি কোন্ গল্পের অন্তর্গত? লেখক কে? বক্তব্যটি কার? কোন্ প্রসঙ্গে? বক্তার এই জাতীয় উক্তির যাথার্থ্য নির্ণয় কর। 'নির্ভয়ে' ও 'মনের সুখে থাকা'—বাক্যাংশ দুটির স্বরূপ নির্ণয় কয়।

(গ) 'গৃহস্বামিনীর ঈদৃশ স্নেহবাক্য····· সীমা রহিল না।'

—গৃহস্বামিনীর স্নেহবাক্যের উল্লেখ কর এবং সদয় ব্যবহারের পরিচয় দাও। বালকের আনন্দের কারণ কী? তার পরিণাম কী হল?

শব্দার্থ লেখ ঃ—

গৃহমার্জন, দৃষ্টিগোচর, কিয়ৎক্ষণ, নিরীক্ষণ, যৎপরোনাস্তি, দৈবাৎ, পরিত্রাণ, সমুদয়, বশীভূত, কৃতাঞ্জলি, বিষণ্ণবদনে, ঈদৃশ, নির্গত, বিদ্বান।

সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ—

পরিষ্কৃত, মনোহর, যৎপরোনাস্তি, প্রত্যক্ষ, অপেক্ষা, উদ্যত, কৃতাঞ্জলি, নির্গত, জগদীশ্বর, তজ্জন্য, সচ্চরিত্র, আনন্দাশ্রু, বিদ্যোপার্জন।

লিঙ্গ পরিবর্তন কর ঃ—

গৃহস্বামিনী, বালক, সচ্চরিত্র, ধনবান, বিদ্বান, ধর্মপরায়ণ।

পদ পরিবর্তন কর ঃ—

পরিষ্কৃত, পুলকিত, সৌন্দর্য, ঔজ্জল্য, মোহিত, লোভ, সংবরন, ক্লেশ, কাতর, ভীরু, পুরস্কার, প্রবিষ্ট, পরিশ্রম।

অশুদ্ধি সংশোধন কর ঃ—

নিরিক্ষণ, উজ্জল্য, রাজদণ্ড, বশিভূত, বাস্প, পুরষ্কার, জগদিশ্বর, বিদ্যান।

সমনাম শব্দ লেখ ঃ— (প্রত্যেকটির কমপক্ষে তিনটি)

স্বর্ণ, ঈশ্বর, জননী, বস্ত্র, ইচ্ছা।

———

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



[১৮৩৮ সালের ২৬শে জুন চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত কাঁঠালপাড়া গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে একটা নূতন যুগ সৃষ্টি করেন। তাঁর অসামান্য প্রতিভার স্পর্শে গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-সমালোচনা প্রভৃতি সমৃদ্ধ হয়। দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, রজনী প্রভৃতি উপন্যাস তাঁর অসাধারণ মনীষার পরিচয় বহন করছে। ১৮৯৪ সালের ৮ই এপ্রিল বঙ্কিমচন্দ্র পরলোকগমন করেন।]

১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে একদিন পদচিহ্ন গ্রামে রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল। গ্রামখানি গৃহময়—কিন্তু লোক দেখি না। বাজারে সারি সারি দোকান, হাটে সারি সারি চালা, পল্লীতে পল্লীতে শত শত মৃন্ময় গৃহ, মধ্যে মধ্যে উচ্চ-নীচ অট্টালিকা, আজ সব নীরব। বাজারে দোকান বন্ধ, দোকানদার কোথায় পলাইয়াছে ঠিকানা নাই। আজ হাটবার, হাটে হাট লাগে নাই। ভিক্ষার দিন, ভিক্ষুকেরা বাহির হয় নাই। তন্তুবায় তাঁত বন্ধ করিয়া গৃহপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতেছে, ব্যবসায়ী ব্যবসা ভুলিয়া শিশু ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছে, দাতারা দান বন্ধ করিয়াছে, অধ্যাপক টোল বন্ধ করিয়াছে, শিশুও বুঝি আর সাহস করিয়া কাঁদে না। রাজপথে লোক দেখি না, সরোবরে স্নাতক দেখি না, গৃহদ্বারে মনুষ্য দেখি না, বৃক্ষে পক্ষী দেখি না, গোচারণে গোরু দেখি না, কেবল শ্মশানে শৃগাল কুক্কুর। এক বৃহৎ অট্টালিকা—তাহার বড় বড় ছড়ওয়ালা থাম

দূর হইতে দেখা যায়—সেই গৃহারণ্যমধ্যে শৈলশিখরবৎ শোভা পাইতেছিল। শোভাই বা কি, তাহার দ্বার রুদ্ধ, গৃহ মনুষ্যসমাগমশূন্য, শব্দহীন, বায়ুপ্রবেশের পক্ষেও বিঘ্নময়। তাহার অভ্যন্তরে ঘরের ভিতর মধ্যাহ্নে অন্ধকার, অন্ধকারে নিশীথফুল্লকুসুমযুগলবৎ এক দম্পতি বসিয়া ভাবিতেছে। তাহাদের সম্মুখে মন্বন্তর।

১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ্য হইল,—লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায়-গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল, দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গায়িল, কৃষকপত্নী আবার রূপার পৈঁচার জন্য স্বামীর কাছে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে-কার্ত্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্যসকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল, যাহার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না, প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস করিল, তার পর এক সন্ধ্যা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল, তার পর দুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। যে-কিছু চৈত্র ফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না।

লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পরে কে ভিক্ষা দেয়!—উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তার পরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল-জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী বেচিল। জোত-জমা বেচিল, তার পরে মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে

পলাইল। যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

রোগ সময় পাইল—জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষতঃ বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে? কেহ কাহারও চিকিৎসা করে না; কেহ কাহাকে দেখে না; মরিলে কেহ ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্টালিকা মধ্যে আপনা আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পলায়।

মহেন্দ্র সিংহ পদচিহ্ন গ্রামে বড় ধনবান্—কিন্তু আজ ধনী-নির্ধনের এক দর। এই দুঃখপূর্ণ কালে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তাঁহার আত্মীয়স্বজন, দাসদাসী সকলেই গিয়াছে। কেহ মরিয়াছে, কেহ পলাইয়াছে। সেই বহুপরিবারমধ্যে এখন তাঁহার ভার্যা ও তিনি স্বয়ং আর এক শিশুকন্যা। তাঁহাদেরই কথা বলিতেছিলাম।

তাঁহার ভার্যা কল্যাণী চিন্তা ত্যাগ করিয়া, গো-শালে গিয়া স্বয়ং গো দোহন করিলেন। পরে দুগ্ধ তপ্ত করিয়া কন্যাকে খাওয়াইয়া গোরুকে ঘাস-জল দিতে গেলেন। ফিরিয়া আসিলে মহেন্দ্র বলিল, "এরূপে কদিন চলিবে?"

কল্যাণী বলিল, "বড় অধিক দিন নয়। যত দিন চলে; আমি যত দিন পারি, চালাই, তার পর তুমি মেয়েটি লইয়া শহরে যাইও।"

মহেন্দ্র বলিল, "শহরে যদি যাইতে হয়, তবে তোমায় বা কেন এত দুঃখ দিই? চল না এখনই যাই।"

পরে দুই জনে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইল।

কল্যাণী বলিল, "শহরে গেলে কিছু বিশেষ উপকার হইবে কি?"

মহেন্দ্র—"সে স্থান হয়ত এমনি জনশূন্য, প্রাণরক্ষার উপায় শূন্য হইয়াছে।"

কল্যাণী—"মুর্শিদাবাদ, কাশিমবাজার বা কলিকাতায় গেলে প্রাণরক্ষা হইতে পারিবে। এ স্থান ত্যাগ করা সকল প্রকারে কর্তব্য।"

পরদিন প্রভাতে দুই জনে কিছু অর্থ সঙ্গে লইয়া, ঘরদ্বারের চাবি বন্ধ করিয়া, গোরুগুলি ছাড়িয়া দিয়া, কন্যাটিকে কোলে লইয়া রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

॥ অনুশীলনী ॥

সাধারণ প্রশ্ন :—

১। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' বলতে লেখক কি বুঝিয়েছেন? এই মন্বন্তরের একটি বাস্তব চিত্র দাও।

২। "শহরে গেলে কিছু বিশেষ উপকার হইবে কি?"—বক্তা কে? ওঁদের পরিচয় দাও, তাঁরা কি জন্য গৃহত্যাগ করলেন?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :—

১। (ক) 'লোকে ভাবিল, দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন।'—কথন? দেবতার কৃপা করার অর্থ কি?

(খ) 'অকস্মাৎ আশ্বিনে দেবতা বিমুখ হলেন।'—'দেবতা বিমুখ' হওয়ার অর্থ কি? তার ফল কি হল?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :—

১। (ক) 'গ্রামখানি ·······দেখি না।'—উক্তিটি কোন্ প্রবন্ধের? —রচনাটি কার লেখা? 'গ্রামখানি গৃহময়'—কথার অর্থ কি? গ্রামের ঘরে লোক নেই কেন?

(খ) 'তাহার অভ্যন্তরে ····· বসিয়া ভাবিতেছে।'

—ঘরটি কেমন? 'মধ্যাহ্নে অন্ধকার'—কেন? 'নিশীথফুল্লকুসুমযুগলবৎ' কথার অর্থ কি? দম্পতি শব্দের অর্থ নির্ণয় কর। 'দম্পতি'—কারা। তাঁরা বসে বসে কি ভাবছেন? তাঁদের ভাবনার স্বরূপ নির্ধারণ কর।

(গ 'এ স্থান ·· ···কর্তব্য।'

—বক্তব্যটি কার? কাকে একথা বলা হয়েছে? তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক কি? কোন্ স্থানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে? 'স্থান ত্যাগ করা'র ভাবনা কেন? বক্তা কোথায় যেতে চেয়েছেন? পরে তাঁরা কি করলেন?

মৌখিক প্রশ্ন :—

১। (ক) ১১৭৬ সালে কোথায় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল এবং তার কারণ কি?

(খ) ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় বাংলাদেশে রাজস্ব আদায়ের কর্তা কে ছিলেন?

(গ) কোন্ সালে কৃষক-পত্নী তার স্বামীর কাছে রূপার পৈঁচার জন্য বায়না ধরেছিল?

(ঘ) মহেন্দ্র সিংহ কোথায় বাস করতেন?

শব্দার্থ লেখ :—

মন্বন্তর, মৃন্ময়, তন্তুবায়, টোল, স্নাতক, গোচারণ, শৈলশিখরবৎ, মনুষ্যসমাগম-শূন্য, নিশীথফুল্লকুসুমযুগলবৎ, মহার্ঘ্য, রাজস্ব, কড়ায়-গণ্ডায়, রুপা, দৌরাত্ম্য, অকস্মাৎ, কাহন, উপবাস, খরিদ্দার, বন্য, ওলাউঠা, বপু, ভার্যা, স্বয়ং, গো-দোহন।

শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

১। (ক) — লোক দেখি, না, সরোবরে—দেখি না, — মনুষ্য দেখি না, বৃক্ষে — দেখি না, — গোরু দেখি না, কেবল শ্মশানে —।

(খ) প্রথমে এক সন্ধ্যা — করিল ও তারপর এক সন্ধ্যা — করিয়া খাইতে লাগিল, তারপর — উপবাস আরম্ভ করিল। যে কিছু—ফসল হইল কাহারও —তাহা—না।

(গ) খাদ্যাভাবে গাছের — খাইতে লাগিল, — খাইতে আরম্ভ করিল, — খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা — — — খাইতে লাগিল।

বাক্য রচনা কর :—

তন্তুবায়, অধ্যাপক, রুদ্ধ, রুপা, দৌরাত্ম্য, চৈত্র, চিকিৎসা, দর।

সন্ধি বিচ্ছেদ কর :—

মৃন্ময়; নীরব, গৃহারণ্য, অভ্যন্তরে, মন্বন্তর, রোগাক্রান্ত।

লিঙ্গান্তর কর :—

ভিক্ষুক, দাতা, অধ্যাপক, পক্ষী, কুক্কুর, রাজা, দেবতা, স্বামী, ধনবান।

পদান্তর কর :—

প্রবল, রুদ্ধ, ক্লেশ, আরম্ভ, স্পর্শ, প্রবেশ, চিন্তা, তপ্ত, অধিক, উপকার।

বিপরীতার্থক শব্দ লেখ :—

গ্রাম, নীরব, দাতা, কেনা, ইতর, ধনী, উপকার।

সমনাম শব্দ লেখ ঃ— (প্রত্যেকটির কমপক্ষে তিনটি)

গৃহ, অধ্যাপক, পথ, পত্নী, স্বামী, গোরু, বপু, শহর।

নিম্নরেখ পদগুলোর কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ—

(ক) বাজারে দোকান বন্ধ, দোকানদার কোথায় পলাইয়াছে ঠিকানা নাই।

(খ) আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গায়িল।

(গ) তারপরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল।

(ঘ) গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল।

(ঙ) গোরুকে ঘাস-জল দিতে গেলেন।

অশুদ্ধি সংশোধন কর ঃ—

নিরব, ব্যবসায়ি, শশানে, রুপা, জর, খয়রোগ, সয়ং, শুন্য।

———





[১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই মে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুর রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু ছিলেন। রামমোহন রায়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। রামমোহন প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের উপাসনা পদ্ধতির তিনিই প্রচারক ছিলেন। ইংরাজী, ফারসী, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাঁর রচিত 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান', 'ব্রাহ্মধর্ম', 'জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি', 'পরলোক ও মুক্তি' এবং 'আত্মজীবনী' প্রভৃতি গ্রন্থ অতি মূল্যবান। তাঁর ধর্মপ্রাণতার জন্য তিনি 'মহর্ষি' উপাধি লাভ করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে জানুয়ারী তিনি পরলোক গমন করেন।]

দিদিমা আমাকে বড় ভালবাসিতেন। শৈশবে তাঁহাকে ব্যতীত আমিও আর কাহাকে জানিতাম না। শয়ন উপবেশন ভোজন, সকলই তাঁহার নিকট হইত। তিনি কালীঘাটে যাইতেন, আমি তাঁহার সহিত যাইতাম। তিনি যখন আমাকে ফেলিয়া জগন্নাথক্ষেত্রে ও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন আমি বড়ই কাঁদিতাম।

ধর্মে তাঁহার অত্যন্ত নিষ্ঠা ছিল; তিনি প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিতেন, এবং প্রতিদিন শালগ্রামের জন্য সহস্তে পুষ্পের মালা গাঁথিয়া দিতেন। কখনো কখনো তিনি সংকল্প করিয়া উদয়াস্ত সাধন করিতেন, সূর্যোদয় হইতে সূর্যের অস্তকাল পর্যন্ত সূর্যকে অর্ঘ্য দিতেন।

তিনি এক একদিন হরিবাসর করিতেন, সমস্ত রাত্রি কথা হইত, এবং কীর্তন হইত ; তাহার শব্দে আমরা আর রাত্রে ঘুমাইতে পারিতাম না।

তিনি সংসারের সমস্ত তত্ত্বাবধারণ করিতেন, এবং স্বহস্তে অনেক কার্য করিতেন। তাঁহার কার্যদক্ষতার জন্য ও তাঁহার শাসনে গৃহের সকল কার্য সুশৃঙ্খলরূপে চলিত। পরে সকলের আহারান্তে তিনি স্বপাকে আহার করিতেন। আমিও তাঁহার হবিষ্যান্নের ভাগী ছিলাম। তাঁহার সেই প্রসাদ আমার যেমন স্বাদু লাগিত, তেমন আপনার খাওয়া ভাল লাগিত না।

তাঁহার শরীর যেমন সুন্দর ছিল, কার্যেতে তেমনি তাঁহার পটুতা ছিল, এবং ধর্মেতেও তেমনি তাঁহার আস্থা ছিল। কিন্তু তিনি মা-গোঁসাইয়ের সতত যাতায়াত বড় সহিতে পারিতেন না। তাঁহার ধর্মের অন্ধবিশ্বাসের সহিত একটু স্বাধীনতাও ছিল।

আমি তাঁহার সহিত আমাদের পুরাতন বাড়ীতে গোপীনাথ ঠাকুর দর্শনার্থে যাইতাম। কিন্তু আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে ভালবাসিতাম না ; তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া গবাক্ষ দিয়া শান্তভাবে সমস্ত দেখিতাম। এখন আমার দিদিমা আর নাই। কিন্তু, কতদিন পরে, কত অন্বেষণের পরে, আমি এখন আমার দিদিমার দিদিমাকে পাইয়াছি ও তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া জগতের লীলা দেখিতেছি।

দিদিমা মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে আমাকে বলেন, 'আমার যা কিছু আছে আমি তাহা আর কাহাকেও দিব না, তোমাকেই দিব।' পরে তিনি তাঁহার বাক্সের চাবিটা আমাকে দেন। আমি তাঁহার বাক্স খুলিয়া কতকগুলিন টাকা ও মোহর পাইলাম। লোককে বলিলাম যে, 'আমি মুড়ি-মুড়কি পাইয়াছি।'

১৭৫৭ শকে দিদিমার যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত, তখন আমার পিতা এলাহাবাদ অঞ্চলে পর্যটন করিতে গিয়াছিলেন। বৈদ্য আসিয়া কহিল, আর গৃহে রাখা হইবে না। অতএব সকলে আমার পিতামহীকে গঙ্গা-তীরে লইয়া যাইবার জন্য বাড়ীর বাহিরে আনিল। কিন্তু দিদিমা মরেও বাঁচতে চান, গঙ্গায় যাইতে তাঁহার মত নাই। তিনি বলিলেন যে,

যদি দ্বারকানাথ থাকিত তবে তোরা কখনই আমাকে লইয়া যাইতে পারতিস নে। কিন্তু লোকে তাহা শুনিল না। তাঁহাকে লইয়া গঙ্গা-তীরে চলিল। তখন তিনি কহিলেন, 'তোরা যেমন আমার কথা না শুনে আমাকে গঙ্গায় নিয়ে গেলি, তেমনি আমি তোদের সকলকে খুব কষ্ট দিব; আমি শীঘ্র মরিব না।' গঙ্গাতীরে লইয়া একটি খোলার চালাতে তাঁহাকে রাখা হইল। সেখানে তিনি তিন রাত্রি জীবিত ছিলেন। আমি সেই সময়ে গঙ্গাতীরে তাঁহার সঙ্গে নিয়ত থাকিতাম।

দিদিমার মৃত্যুর পূর্বদিন রাত্রিতে আমি ঐ চালার নিকটবর্তী নিমতলার ঘাটে একখানা চাঁচের উপর বসিয়া আছি। ঐদিন পূর্ণিমার রাত্রি, চন্দ্রোদয় হইয়াছে, নিকটে শ্মশান। তখন দিদিমার নিকট নাম সঙ্কীর্তন হইতেছিল, এমন দিন কি হবে, হরিনাম বলিয়া প্রাণ যাবে; বায়ুর সঙ্গে তাহা অল্প অল্প আমার কানে আসিতেছিল। এই অবসরে হঠাৎ আমার মনে এক আশ্চর্য ভাব উপস্থিত হইল। আমি যেন আর পূর্বের মানুষ নই। ঐশ্বর্যের উপর একেবারে বিরাগ জন্মিল, যে চাঁচের উপর বসিয়া আছি, তাহাই আমার পক্ষে ঠিক বোধ হইল; গালিচা দুলিচা সকল হেয় বোধ হইল; মনের মধ্যে এক অভূতপূর্ব আনন্দ উপস্থিত হইল।

॥ অনুশীলনী ॥

সাধারণ প্রশ্ন :—

১। দিদিমার ধর্মপরায়ণতা ও কর্মপটুতার পরিচয় দাও।

২। দিদিমার সঙ্গে লেখকের স্নেহসম্পর্ক কেমন ছিল তার উল্লেখ কর।

৩। শ্মশানে লেখকের অভিজ্ঞতার বিবরণ দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :—

১। (ক) "লোককে বলিলাম যে, আমি 'মুড়ি-মুড়কি' পাইয়াছি।"—বক্তা কে?' 'মুড়ি-মুড়কি' কথাটি এখানে কোন্ অর্থে প্রযুক্ত? 'মুড়ি-মুড়কি'—শব্দ দুটির মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

(খ) 'রোগীকে আর গৃহে রাখা হইবে না।'—বক্তা কে? রোগীই বা কে? রোগীকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হল এবং কেন?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ

১। (ক) কিন্তু, কতদিন পরে ········জগতের লীলা দেখিতেছি।

—এখানে 'আমি' কে ? 'দিদিমাই' বা কে ? 'কতদিন পরে কত অন্বেষণের পরে'—বাক্যাংশগুলোর প্রসঙ্গ নির্ণয় কর। তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া জগতের লীলা দেখিতেছি।—লেখকের এই জাতীয় উপলব্ধির পরিচয় দাও।

(খ) যে চাঁচের উপর বসিয়া আছি ·····আনন্দ উপস্থিত হইল।

—কাহিনীটির নাম কি ? কাহিনীকার কে ? বক্তব্যটি কার ? 'চাঁচ' কি ? 'তাহাই আমার পক্ষে ঠিক বোধ হইল'—এ কথার অর্থ কি ? 'গালিচা দুলিচাকে' হেয় মনে করার কারণ কি ? 'অভূতপূর্ব আনন্দ'টি কি ব্যাখ্যা কর।

মৌখিক প্রশ্ন ঃ—

১। (ক) তিনি যখন আমাকে ফেলে জগন্নাথক্ষেত্র ও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন আমি বড়ই কাঁদিতাম।—তিনি কে ?' জগন্নাথক্ষেত্র কোথায় ? 'বৃন্দাবন' কি ? সেই জায়গাটি কার লীলাক্ষেত্র ? 'আমি' কে ? বক্তা কাঁদতেন কেন ?

(খ) আমিও তাঁহার হবিষ্যান্নের ভাগী ছিলাম.—'আমি' কে ? 'তাঁহার বলতে কার কথা বলা হয়েছে ? 'হবিষ্যান্ন' কি ? তার স্বাদ বক্তার পক্ষে কেমন ছিল ?

(গ) যদি দ্বারকানাথ থাকিত তবে তোরা কখনই আমাকে লইয়া যাইতে পারতিস নে।—বক্তব্যটি কার ?' 'দ্বারকানাথ' কে ? বক্তার সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক ? বক্তাকে কোথায় নিয়ে, যাওয়া হচ্ছিল এবং কেন ?

শব্দার্থ লেখ ঃ

উপবেশন, নিষ্ঠা, প্রত্যূষে, অর্ঘ্য, তত্ত্বাবধারণ, পটুতা, অন্ধবিশ্বাসের, দর্শনার্থে, গবাক্ষ, পর্যটন, বিরাগ, অভূতপূর্ব।

সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ

উদ্বাস্তু, তত্ত্বাবধারণ, স্বাধীনতা, দর্শনার্থে, গবাক্ষ, অন্বেষণের, আশ্চর্য।

বাক্যে প্রয়োগ কর ঃ

ব্যতীত, প্রতিদিন, স্বাদু, পটুতা, ক্রোড়ে, নিয়ত, নিকটবর্তী।

বিপরীতার্থক শব্দ লেখ ঃ

সূর্যোদয়, স্বাদু, স্বাধীনতা, পুরাতন, শীঘ্র, রাত্রি, জীবিত, পূর্ণিমা, ঠিক।

———



[১৮৬১ সালের ৭ই মে কলকাতার জোড়াসাঁকোয় বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্র-প্রতিভা এক বিস্ময়ের বস্তু। সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অবদান অপরিসীম। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য ভারতবর্ষে তিনি সর্বপ্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর রচিত 'জনগণমন' গানটি স্বাধীন ভারতে জাতীয় সংগীতরূপে গৃহীত হয়। ১৯৪১ সালে ৭ই আগষ্ট বিশ্ববরেণ্য কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।]

[হাঁপাইতে হাঁপাইতে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে হারাধনের প্রবেশ]

হারাধন। বাবা! ডাক্তারসাহেবের আস্তাবল থেকে হাঁসের ডিম চুরি করতে গিয়ে আজ আচ্ছা নাকাল হয়েছি। সাহেব যেরকম তাড়া করে এসেছিল, মরেছিলাম আর কি! ভয়ে পালাতে গিয়ে খানার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলুম। পা ভেঙে গেছে—তাতে দুঃখ নেই, প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি এই ঢের। রোগীগুলোকে হাতে পেলে ডাক্তার-সাহেব পটপট ক'রে মেরে ফেলে, আমার কোনো ব্যামো-স্যামো নেই, আমাকেই তো মেরে ফেলবার জো করেছিল। এবার রোজ রোজ আর হাঁসের ডিম চুরি করব না; একেবারে আস্ত হাঁস চুরি করব, আমাদের বাড়িতে ডিম পাড়বে।

[নেপথ্য হইতে।] হারু।

হারাধন। [সভয়ে] ওই রে, বাবা এসেছে। আমার একটা পা

খোঁড়া দেখলে মারের চোটে বাবা আর একটা পা খোঁড়া ক'রে দেবে।

[নেপথ্যে পুনশ্চ] হারু। [নিরুত্তর]। হারা। [নিরুত্তর] হেরো।

[পিতার প্রবেশ]

হারাধন। (অগ্রসর হইয়া) আজ্ঞে।

পিতা। তুই খোঁড়াচ্ছিস যে।

[হারাধনের মাথা চুলকন]

পিতা। (সরোষে) পা ভাঙলি কি করে?

হারাধন। (সভয়ে) আজ্ঞে, আমি ইচ্ছে করে ভাঙিনি।

পিতা। তা তো জানি, কী করে ভাঙল সেইটে বল্ না।

হারাধন। জানি নে বাবা!

পিতা। বটে! এই লাঠির বাড়িতে তোর মাথাটা ভাঙলে তবে টের পাবি বুঝি!

হারাধন। (তাড়াতাড়ি হাত দিয়া মাথা আড়াল করিয়া) না বাবা! ওই মাথাটা বাঁচাতে গিয়েই পা-টা ভেঙেছি।

পিতা। বুঝেছি। তবে বুঝি সেদিনকার মতো ডাক্তারসাহেবের বাড়িতে হাঁসের ডিম চুরি করতে গিয়েছিলি। তাই তারা মেরে তোর পা ভেঙে দিয়েছে! লক্ষ্মীছাড়া, তোর কি কিছুতেই চৈতন্য হবে না?

হারাধন। চৈতন্য কাকে বলে বাবা?

পিতা। চৈতন্য কাকে বলে দেখবি? (পিঠে কিল মারিয়া) চৈতন্য একে বলে।

হারাধন। এ তো আমার রোজই হয়।

পিতা। আমি দেখছি তুমি জেলে গিয়েই মরবে।

হারাধন। না বাবা, রোজ চৈতন্য পেলে ঘরে মরব!

পিতা। নাঃ, তোকে নিয়ে আর পেরে উঠলেম না।

হারাধন। (চুপড়ির দিকে চাহিয়া) বাবা, তাল এনেছ কার জন্যে ? আমি খাব।

পিতা। (পৃষ্ঠে কিল মারিয়া) এই খাও!

হারাধন। (পিঠে হাত বুলাইয়া) এ তো ভালো লাগল না!

[নেপথ্যে] হারু!

হারাধন। কী মা!

[নেপথ্যে] তোর জন্যে তালের বড়া করে রেখেছি—খাবি আয়।

(খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে হারাধনের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(ডাক্তারসাহেবের আস্তাবলে হারাধন হাঁস চুরি-করতে প্রবৃত্ত)

পিতা। (দূর হইতে) হারু!

হারাধন। ওই রে, বাবা আসছে, কী করি!

(হারাধনের গলা হইতে পেট পর্যন্ত থলি ঝুলিতেছিল, তাড়াতাড়ি থলির মধ্যে হাঁস পুরিয়া ফেলিল।)

পিতা। হারু! (নিরুত্তর) হারা। (নিরুত্তর) হেরো।

হারাধন। আজ্ঞে!

পিতা। তোর পেট হঠাৎ অমন ফুলে উঠল কী করে ?

হারাধন। বাবা, কাল সেই তালের বড়া খেয়ে।

পিতা। অমন ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ শব্দ হচ্ছে কেন ?

হারাধন। পেটের ভিতর নাড়ীগুলো ডাকছে।

পিতা। দেখি, পেটে হাত দিয়ে দেখি।

হারাধন। (শশব্যস্তে) ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না, বড্ড ব্যথা হয়েছে।

(পেটের মধ্যে ক্যাঁক্ ক্যাঁক্)

পিতা। (স্বগত) সব বোঝা গেছে। হতভাগাকে জব্দ করতে হবে। (প্রকাশ্যে) তোমার রোগ সহজ নয়। এস বাপু হাসপাতালে নিয়ে যাই।

হারাধন। না বাবা, এমন মাঝে মাঝে হয়, আপনি সেরে যায়।

(ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ ক্যাঁক্)

পিতা। কই রে এ তো ক্রমেই বাড়ছে। চল্ আর দেরি নয়।

(টানিয়া লইয়া প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(হারাধন, পিতা ও মাতা)

মা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) বাছার আমার কি হল গা।

পিতা। হ্যাঁগো, তুমি বেশী গোল কোরো না। হাসপাতালে নিয়ে গেলেই এ ব্যামো সেরে যাবে।

মা। আমি বেশি গোল করছি, না তোমার ছেলের পেট বেশি গোল করছে। (সভয়ে) এ যে হাঁসের মত ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করে। বাবা হারু, তোকে আর আমি হাঁসের ডিম খেতে দেব না—তোর পেটের মধ্যে হাঁস ডাকছে—কী হবে! [ক্রন্দন]

হারাধন। (তাড়াতাড়ি) না মা, ও হাঁস নয়, ও তালের বড়া। হাঁস তোমাকে কে বললে? কখ্‌খনো হাঁস নয়। হাঁস হতেই পারে না। আচ্ছা, বাজি রাখো যদি তালের বড়া হয়।

মা। তালের বড়া কি অমন করে ডাকে বাছা!

হারাধন। তুমি একটু চুপ করো মা! তোমাদের গোলমাল শুনে পেটের ভিতর আরো বেশি করে ডাকছে।

পিতা। বোসেদের বাড়ি আমার একটু কাজ আছে; আমি কাজ সেরেই হারুকে নিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছি। [প্রস্থান]

(ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ ক্যাঁক্)

মা। ওগো, এ যে ক্রমেই বাড়তে চলল। ওগো মুখুজ্যেমশাই!

(মুখুজ্যে মশায়ের প্রবেশ)

মুখুজ্যে। কী গো বাছা?

মা। বাছার আমার ক্রমেই বাড়তে লাগল। একে শিগ্‌গির—ওই যে কি বলে ওই—তোমাদের হাঁসপাতালে নিয়ে চলো।

মুখুজ্যে। আমি তো তাই প্রথম থেকেই বলছি, হারুর বাবাই তো এতক্ষণ দেরি করিয়ে রাখলে। (হারার প্রতি) তবে চল্ ওঠ্।

হারাধন। না, দাদামশায়, আমি হাসপাতালে যাব না, আমার কিছু হয় নি।

মুখুজ্যে। কিছু হয়নি বটে। তোর পেটের ডাকের চোটে পাড়াসুদ্ধ অস্থির হ'য়ে উঠল। পেটের মধ্যে বাত শ্লেষ্মা পিত্ত তিনটিতে মিলে যেন দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়ে দিয়েছে। (বলপূর্বক লইয়া যাওন)

চতুর্থ দৃশ্য

(হাসপাতালে ডাক্তার সাহেব ও হারাধন)

ডাক্তার। টোমার পেটে কী হইয়াছে ?

হারাধন। কিছু হয়নি সাহেব, এবার আমাকে মাপ করো সাহেব, আমার কিছু হয়নি।

ডাক্তার। কিছু হয়নি টো এ কী ?

(পেটে খোঁচা দেওন ও দ্বিগুণ ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ শব্দ)

(হাসিয়া) টোমার ব্যামো আমি সমষ্ট বুঝিয়াছি।

হারাধন। তোমার গা ছুঁয়ে বলছি সাহেব, আমার কোনো ব্যামো হয়নি। এমন কাজ আর কখনো করব না।

ডাক্তার। টোমার ভয়ানক ব্যামো হইয়াছে।

হারাধন। সাহেব, আমার ব্যামো আমি জানিনে, তুমি জান!

(ক্যাঁক্ ক্যাঁক্)

(সরোষে থলিতে চাপড় মারিয়া) আ মোলো যা, এর যে ডাক কিছুতেই থামে না।

ডাক্তার। (বৃহৎ ছুরি লইয়া) টোমার চুরি ব্যামো হইয়াছে, ছুরি না ডিলে সারিবে না। (পেট চিরিতে উদ্যত)

হারাধন। (কাঁদিয়া হাঁস বাহির করিয়া) সাহেব, এই নাও তোমার হাঁস। তোমার এ হাঁস কোনোমতেই আমার পেটে সইল না! এর চেয়ে ডিমগুলো ছিল ভালো।

(হারাধনকে ধরিয়া সাহেবের প্রহার)

সাহেব, আর আবশ্যক নেই, আমার ব্যামো একেবারেই সেরে গেছে।

॥ অনুশীলনী ॥

সাধারণ প্রশ্ন ঃ—

১। হারাধনের কি রোগ হয়েছিল? ঐ রোগের চিকিৎসা কিভাবে করা হল?

২। নাটিকাটিতে হারাধনের চরিত্র যেভাবে অঙ্কিত হয়েছে তার পরিচয় দাও।

৩। 'রোগের চিকিৎসা' নাটিকাটির কাহিনী নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ—

১। (ক) 'না বাবা! ওই মাথাটা বাঁচাতে গিয়েই পা-টা ভেঙেছি।' —বক্তা কে? তার বাবা কেমন প্রকৃতির লোক? 'মাথাটা বাঁচাতে গিয়েই পা-টা ভেঙেছি'—এই সরস মন্তব্যের ব্যাখ্যা দাও।

(খ) 'না বাবা, রোজ চৈতন্য পেলে ঘরে মরব'।—'চৈতন্য' কথার অর্থ কি? ঘটনাটির প্রসঙ্গ নির্ণয় কর। 'রোজ চৈতন্য পেলে ঘরে মরব'—এই শ্লেষটির সরল অর্থ বুঝিয়ে বল।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ

১। (ক) 'পেটের মধ্যে বাত·····দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়ে দিয়েছে।'

—নাটিকাটির নাম কি? নাট্যকার কে? উদ্ধৃতিটি কার? কাকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে? বক্তব্যের প্রসঙ্গ নির্ণয় কর। 'বাত-শ্লেষা পিত্ত' শরীরে কিরূপ উৎপাত ঘটায়? 'দাঙ্গাহাঙ্গামা'—কথাটি কোন্ অর্থে প্রযুক্ত?

(খ) 'টোমার চুরি ব্যামো·····ছুরি না ডিলে সারিবে না।'

—বক্তা কে? কাকে লক্ষ্য করে তিনি একথা বলেছেন? ঘটনাটির প্রসঙ্গ নির্ণয় কর। চুরি করার সঙ্গে ব্যামোর তুলনা করা কতদূর যুক্তিসংগত? উদ্দিষ্ট ব্যক্তির চুরি ব্যামো কিভাবে নিরাময় হল তার বর্ণনা দাও।

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। (ক) হারুর ভাল নাম কি? (খ) তার স্বভাব কেমন ছিল? (গ) 'টোমার' 'সমষ্ট'—এই উচ্চারন রীতি কাদের?

শব্দার্থ লেখ ঃ—

পটপট, জো, পুনশ্চ, নিরুত্তর, সরোষে, শশব্যস্তে, চৈতন্য।

বাক্যগঠন কর ঃ—

আস্তাবল, ঢের, আস্ত, সহজ, গোল, শিগ্‌গির, অস্থির।

———



[১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই আগষ্ট জোড়াসাঁকো, কলকাতার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে অবনীন্দ্রনাথ ভূমিষ্ঠ হন। তাঁর পিতা গুণেন্দ্রনাথ ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র। চিত্রশিল্পী হিসেবে তিনি পৃথিবীখ্যাত এবং সাহিত্যিকরূপে বাংলা সাহিত্যে তাঁর যথেষ্ট সমাদর রয়েছে। তাঁর অঙ্কিত 'নির্বাসিত যক্ষ', 'সাজাহানের মৃত্যু', 'বুদ্ধ ও সুজাতা' প্রভৃতি চিত্র উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত 'শকুন্তলা', 'ভূতপত্‌রীর দেশ', 'নালক', ক্ষীরের পুতুল', 'রাজকাহিনী', 'বুড়ো আংলা', 'ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ' প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক রচনার নিদর্শন বহন করছে। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই ডিসেম্বর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।]

একদিন শ্রাবণ মাসে নতুন-নতুন ঘাসের উপর গরুগুলি চরতে দিয়ে বনের পথে বাপ্পাদিত্য একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। সেদিন ঝুলন-পর্ব, রাজপুতদের বড় আনন্দের দিন ; সকাল না হতে দলে-দলে রাখাল নতুন কাপড় পরে, কেউ ছোট ভাইবোনকে কোলে করে, কেউ বা দৈয়ের ভার কাঁধে নিয়ে, একজন তামাসা দেখতে, অন্যজন বা পয়সা করতে, নগেন্দ্রনগরের রাজপুত-রাজার বাড়ির দিকে মেলা দেখতে ছুটল। বাপ্পা প্রকাণ্ড বনে একলা রইলেন ; তাঁর প্রাণের বন্ধু, দুটি ভাই—ভিল বালিয় আর দেব, দিদির হতে ধরে এই আনন্দের দিনে বাপ্পাকে কতবার ডাকলে—"ভাই, তুই কি রাজবাড়ি যাবি ?" বাপ্পা শুধু ঘাড় নাড়লেন,—"না, যাব না।" হয়তো তাঁর মনে হয়েছিল—আমার ভাই

নেই, বোন নেই, মা নেই, আমি কার হাত ধরে কাকে নিয়ে আজ কিসের আনন্দের মেলা দেখতে যাব? কিন্তু যখন বালিয় আর দেব ভিলনীদিদির সঙ্গে-সঙ্গে হাসতে-হাসতে চলে গেল, যখন সকালের রোদ মেঘের আড়ালে ঢেকে গেল, বাপ্পার একটি মাত্র গাই চরতে-চরতে যখন মাঠের পর মাঠ পার হয়ে বনের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল, যখন বনে আর সাড়া শব্দ নেই, কেবল মাঝে-মাঝে ঝিঁঝিঁর ঝিনিঝিনি, পাতার ঝুরুঝুরু, সেই সময় বাপ্পার বড়ই একা-একা ঠেকতে লাগল। তিনি উদাস প্রাণে ভিলনীদিদির মুখে শোনা ভিল-রাজত্বের একটি পাহাড়ী গান, ছোট একটি বাঁশের বাঁশিতে বাজাতে লাগলেন। সেই গানের কথা বোঝা গেল না, কেবল ঘুমপাড়ানি গানের মত তার বুনো সুরটা মেঘলা দিনে বাদলা হাওয়ায় মিশে স্বপনের মতো বাপ্পার চারিদিকে ভেসে বেড়াতে লাগল! আজ যেন তাঁর মনে পড়তে লাগল—ঐ পশ্চিমের দিকে, যেখানে মেঘের কোলে সূর্যের আলো ঝিকিমিকি জ্বলছে, যেখানে কালো-কালো মেঘ পাথরের মতো জমাট বেঁধে রয়েছে, সেইখানে সেই অন্ধকার আকাশের নিচে, তাঁদের যেন বাড়ি ছিল; সেই বাড়ির ছাদে চাঁদের আলোয় তিনি মায়ের হাত ধরে বেড়িয়ে বেড়াতেন; সে বাড়ি কি সুন্দর! সে চাঁদের কি চমৎকার আলো! মায়ের কেমন হাসিমুখ! সেখানে সবুজ ঘাসে হরিণছানা চরে বেড়াত; গাছের উপরে টিয়ে পাখী উড়ে বসত; পাহাড়ের গায়ে ফুলের গোছা ফুটে থাকত—তাদের কি সুন্দর রঙ, কি সুন্দর গলা! বাপ্পা সজল নয়নে মেঘের দিকে চেয়ে-চেয়ে বাঁশের বাঁশিতে ভীলের গান বাজাতে লাগলেন। বাঁশির করুণ সুর কেঁদে-কেঁদে, কেঁপে-কেঁপে বন থেকে বনে ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সেই বনের একধারে আজ ঝুলন-পূর্ণিমায় আনন্দের দিনে, শোলাঙ্কিবংশের রাজার মেয়ে সখীদের নিয়ে খেলে বেড়াচ্ছিলেন। রাজকুমারী বললেন—"শুনেছিস ভাই, বনের ভিতর রাখাল-রাজা বাঁশি বাজাচ্ছে!" সখীরা বললে—"আয় ভাই, সকলে মিলে চাঁপাগাছে দোলা খাটিয়ে ঝুল্‌নো-খেলা খেলি আয়!" কিন্তু দোলা খাটাবার দড়ি

নাই যে। সেই বৃন্দাবনের মতো গহন বন, সেই বাদলা দিনের গুরু গর্জন, সেই দূরে বনে রাখালরাজের মধুর বাঁশি, সেই সখীদের মাঝে শ্রীরাধার সমান রূপবতী রাজনন্দিনা, সবই আজ যুগযুগান্তরের আগেকার বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-রাধার প্রথম ঝুলনের মতো! এমন দিন কি ঝুল্‌না বাঁধার একগাছি দড়ির অভাবে বৃথা যাবে? রাজনন্দিনী গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন। আবার সেই বাঁশি, পাখির গানের মতো, বনের এপার থেকে ওপার আনন্দের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে বেজে উঠল। রাজকুমারী তখন হীরেজড়ানো হাতের বালা সখীর হাতে দিয়ে বললেন—"যা ভাই, এই বালার বদলে ঐ রাখালের কাছ থেকে একগাছা দড়ি নিয়ে আয়।"

রাজকুমারীর সখী সেই বালা-হাতে বাপ্পার কাছে এসে বললে—"এই বালার বদলে রাজকুমারীকে একগাছা দড়ি দিতে পার?" হাসতে-হাসতে বাপ্পা বললেন—"পারি, যদি রাজকুমারী আমাকে বিয়ে করে।"

সেই দিন সেই নির্জন বনে, রাজকুমারীর হাতে সেই হীরের বালা পরিয়ে দিয়ে রাজকুমার বাপ্পা চাঁপাগাছে ঝুল্‌না বেঁধে নিয়ে রাজকন্যার হাত ধরে বসলেন। চারিদিকে যত সখী দোলার উপর বর-কনেকে ঘিরে-ঘিরে ঝুলনের গান গেয়ে ফিরতে লাগল—"আজ কি আনন্দ! আজ কি আনন্দ!"

খেলা শেষ হল, সন্ধ্যা হল; রাজকুমারী বনের রাখালকে বিয়ে করে রাজবাড়িতে ফিরে গেলেন; আর বাপ্পা ফুলে-ফুলে প্রফুল্ল চাঁপার তলায় বসে ঝুলন-পূর্ণিমার প্রকাণ্ড চাঁদের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলেন—আজ কি আনন্দ, আজ কি আনন্দ।

॥ অনুশীলনী ॥

সাধারণ প্রশ্ন ঃ—

১। বাপ্পা নগেন্দ্রনগরের মেলায় যেতে চান নি কেন? বাঁশি বাজাতে বাজাতে তাঁর মনে কি ভাবোদয় হয়েছিল তার বিবরণ দাও।

২। শোলাঙ্কি রাজকন্যার সঙ্গে বাপ্পার কিভাবে পরিচয় হল? ঝুলন-পূর্ণিমা রাতের আনন্দ বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ—

১। (ক) নগেন্দ্রনগরে কোন্ মেলা হচ্ছিল? কার বাড়িতে মেলা বসেছিল? কারা কিভাবে আনন্দ করতে গেছিল?

(খ) 'সে বাড়ি কি সুন্দর! সে চাঁদের কি চমৎকার আলো!'—বক্তা কে? কার বাড়ির কথা বলা হয়েছে? বক্তার বাড়িটি কোথায় ছিল বলেছে? কোন্ দিনের চাঁদের আলোর কথা বলা হয়েছে?

(গ) "যা ভাই; এই বালার বদলে ঐ রাখালের কাছ থেকে এক গাছা দড়ি নিয়ে আয়।"—কে, কাদের 'ভাই' বলে সম্বোধন করেছে? 'রাখাল' কে? 'দড়ি' কি কাজে লাগবে?

(ঘ) 'রাজকুমারী রাখালকে বিয়ে করে রাজবাড়িতে ফিরে গেলেন।'—'রাজকুমারী' কে? বনের রাখালই বা কে? কোন্ রাজবাড়ির কথা বলা হয়েছে?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ—

১। (ক) 'আমার ভাই নেই······মেলা দেখতে যাব?'

—গল্পের নাম কি? রচয়িতা কে? ভাবনাটি কার? কোন্ প্রসঙ্গে এই কথাগুলো বলা হয়েছে? কোথায় কিসের মেলা বসেছিল? উপরোক্ত উক্তি থেকে বক্তার মনোভাবের পরিচয় দাও।

(খ) 'বাঁশির করুন সুর······ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।'

—বাঁশিটি কার? বাঁশির সুর করুণ কেন? প্রসঙ্গটি কি? 'ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে লাগল'—কথাটির তাৎপর্য কি?

(গ) "পারি, যদি রাজকুমারী আমাকে বিয়ে করেন।"

—বক্তা কে? কাকে একথা বলা হয়েছে? 'রাজকুমারী' কে? প্রসঙ্গ নির্ণয় কর। বক্তার এই জাতীয় প্রস্তাবের পেছনে কোন নৈসর্গিক কারণ আছে কি?

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। (ক) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কি বলে আখ্যা দেওয়া হয়? (খ) সাধারণতঃ কোন্ মাসে ঝুলন-পূর্ণিমা হয়? (গ) ঝুল্নো খেলা কেমন? (ঘ) পুরাণ কাহিনীতে কার কার ঝুল্নো খেলার উল্লেখ আছে?

শব্দার্থ লেখ ঃ—

সজল, গহন, বাদলা দিন, রূপবতী, রাজনন্দিনী, নির্জন।

লিঙ্গ পরিবর্তন কর ঃ—

ভিলনী, রাজা, সখী, রাজনন্দিনী, রাজকুমারী, রাজকন্যা।

নিম্নরেখ পদগুলোর কোন্‌টি কি পদ নির্ণয় কর ঃ—

১। (ক) সে বাড়ি কি সুন্দর। (খ) পারি যদি রাজকুমারী আমাকে বিয়ে করেন।

নিম্নলিখিত শব্দ দ্বৈতবাক্যে প্রয়োগ কর ঃ

নতুন-নতুন, হাসতে-হাসতে, ঝিনি-ঝিনি, ঝুরু-ঝুরু, কালো-কালো, কেঁদে-কেঁদে, কেঁপে-কেঁপে, ঘুরে-ঘুরে।

সমনাম শব্দ লেখ ঃ— (প্রত্যেকটির কমপক্ষে তিনটি)

রাজা, মা, ভাই, বোন, বন, ফুল, কন্যা।

———





মাইকেল মধুসূদন

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

[১৮২৭ সালে লেখকের জন্ম হয় কলিকাতার এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। হিন্দু কলেজের মেধাবী ছাত্র ও মাইকেল মধুসূদনের সহপাঠী হইলেন এই লেখক। বাল্যকালে স্থিতধী ব্রাহ্মন পরিবারে জন্মাইবার ফলে কিছুকাল সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন। লেখকেরই প্রচেষ্টায় বিহারে বোধগম্য হিন্দীভাষা প্রচলিত হয় ও বিহারের গ্রাম্য কবি ইহাঁকে 'ভুবনদেব' বলিয়া জয়ধ্বনি করেন। তাঁহার শিক্ষা-সংক্রান্ত গ্রন্থ হল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ইংলণ্ডের ইতিহাস, বাংলার ইতিহাস, পুরাবৃত্ত-সার প্রভৃতি। তাছাড়া দুইখানি ঐতিহাসিক রোমান্স হইল 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' ও 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস'। ১৮৯৪ সালে লেখকের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।]

মধুসূদনের সহিত আমার প্রথম আলাপ হিন্দু কলেজে। সংস্কৃত কলেজ ছাড়িয়া আমি যখন হিন্দু কলেজের সপ্তম শ্রেনীতে আসিয়া ভর্তি হই, তখন মধুও ঐ শ্রেণীতে পড়িত। মধুর যৌবনের প্রাক্কাল, কৈশোর অবস্থা অতিক্রান্ত প্রায় হইয়াছে।

রামচন্দ্র মিত্র নামক জনৈক শিক্ষক আমাদের পড়াইতেন। আমি যেদিন প্রথম ভর্তি হইলাম, সেইদিন রামচন্দ্রবাবু ভূগোল পড়াইবার সময় পৃথিবীর গোলত্বের বিষয় আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন। ইংরাজীওয়ালা মাত্রেই, বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষকেরা ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও স্বদেশীয় শাস্ত্রের প্রতি শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিতে ভালবাসিতেন। আমার

পিতা যে একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন, রামচন্দ্র বাবু তাহা জানিতেন এবং সেই কারণেই পড়াইতে পড়াইতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মত গোল। কিন্তু ভূদেব, তোমার বাবা একথা স্বীকার করিবেন না।" আমি কোন কথা কহিলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম। স্কুলের ছুটির পর বাড়ী আসিলাম। কাপড়-চোপড় ছাড়িতে দেরী সহিল না, একেবারে বাবার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা, পৃথিবীর আকার কি রকম?" তিনি বলিলেন, "কেন বাবা, পৃথিবীর আকার গোল।" এই কথা বলিয়াই আমাকে একখানি পুঁথি দেখাইয়া দিলেন, বলিলেন, "ঐ গোলাধ্যায় পুঁথিখানির অমুক স্থানটি দেখ দেখি?" আমি সেই স্থানটি বাহির করিয়া দেখিলাম, তথায় লেখা রহিয়াছে—"করতলকলিতামলকবদমলং বিদন্তি যে গোলং।" রচনাটি পাঠ করিয়া মনে একটু বলের সঞ্চার হইল। একখানি কাগজে ঐটি টুকিয়া লইলাম।

পরদিন স্কুলে আসিয়া রামচন্দ্র বাবুকে বলিলাম, "আপনি বলিয়াছিলেন, আমার বাবা পৃথিবীর গোলত্ব স্বীকার করিবেন না। কেন, বাবা তো পৃথিবী গোলই বলিয়াছেন; এই দেখুন তিনি বরং এই শ্লোকটি আমাকে পুঁথিমধ্যে দেখাইয়া দিয়াছেন।" রামচন্দ্র বাবু সমস্ত দেখিয়া ও শুনিয়া বলিলেন, "কথাটা বলায় আমার একটু দোষ হইয়াছিল; তা, তোমার বাবা বলিবেন বৈ কি, তবে অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ।"

রামচন্দ্র বাবুতে ও আমাতে যখন এই সকল কথা হয়, তখন ক্লাসের একটি ছেলের চক্ষু আমাতে বিশেষরূপে আকৃষ্ট দেখিতে পাইলাম। বর্ণ কালো হইলেও ছেলেটি দেখিতে বেশ সুশ্রী, শরীর সতেজ, ললাট প্রশস্ত, চক্ষু দুইটি বড় বড় এবং অতিশয় উজ্জ্বল; দেখতে অতি বুদ্ধিমান ও অধ্যবসায়শীল বলিয়া বোধ হয়। যতক্ষন স্কুলে ছিলাম, ততক্ষণই মধ্যে মধ্যে অতি তীব্র দৃষ্টিতে সে আমার দিকে চাহিতেছিল। ছুটির পর একেবারে আমার নিকটে আসিয়া "শেক্‌হ্যাণ্ড" করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, তোমার

নাম কি, কোথায় বাড়ী তোমার" ইত্যাদি। আমি তাহার এইরূপ অতি সুমিষ্ট সম্ভাষণ এবং সৌজন্যে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া একে একে তৎকৃত সকল প্রশ্নের উত্তর দিলাম।

ইনিই মধু। এই দিন হইতেই ইহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা আরব্ধ হইল এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মিল। মধু মধ্যে মধ্যে প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসিতে লাগিল, এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য সমপাঠীদিগের মধ্যেও কেহ কেহ আমাদের বাড়ীতে আসিতে আরম্ভ করিল। আমার মা সকলকেই অতিশয় যত্ন করিতেন; আমাদের সকলকেই খাবার খাইতে দিতেন; গায়ে মাথায় ধূলা লাগিলে চুল আঁচড়াইয়া ও গা ঝাড়িয়া দিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া দিতেন। সেই হইতেই আমার মায়ের উপর মধুর যথেষ্ট শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল।

মধু আমাদের বাড়ীতে আসিত, কিন্তু আমি কোনদিন মধুর বাড়ীতে যাই নাই; মধু আমায় তজ্জন্য কোনদিন অনুরোধও করে নাই। বোধ হয়, আমাদের বাড়ীর ধরন ও মধুর বাবার বাসাবাড়ীর ধরন স্বতন্ত্র ছিল; সুতরাং তথায় লইয়া যাইলে পাছে আমার প্রীতি না হয়, এই জন্যই সম্ভবতঃ মধু আমাকে ওরূপ অনুরোধ কোনদিন করে নাই। ক্লাসে মধু ও আমি একসঙ্গে বসিতাম। মধু যে পুস্তকখানি পড়িত সেখানি আমায় না পড়াইলে তাহার তৃপ্তি হইত না। ফলকথা উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব খুবই প্রগাঢ় হইয়াছিল।

আমরা উভয়ে যখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি; সেই সময়ে আমার স্কুলের ষোল মাসের বেতন বাকী পড়ে। মাসিক পাঁচ টাকা হিসাবে বেতন, ষোল মাসে আশি টাকা হয়। আমার পিতা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন; সুতরাং এত টাকা পরিশোধের পর আবার মাসিক পাঁচ টাকা বেতন দিয়া আমাকে হিন্দু কলেজে পড়ান তাঁহার পক্ষে বড় সুসাধ্য ছিল না; অগত্যা আমার হিন্দু কলেজে পড়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। মধু সেই কথা শুনিয়া বলিল, "তুমি নাকি হিন্দু কলেজে পড়া বন্ধ করিবে?" আমি বলিলাম, "হাঁ, আমাদের অবস্থা ত বুঝিতেছ;

পাঁচ টাকা করিয়া মাসিক বেতন দেওয়া বাবার পক্ষে কষ্টকর, কাজেই আমাকে পড়া বন্ধ করিতে হইবে।"

এই কথায় মধু বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, "কেন ভাই, টাকার জন্য তোমার পড়া বন্ধ হইবে? আমি ত আমার মায়ের কাছ থেকে অনেক টাকা জলপানি পাই, আমার টাকা হইতে তোমার স্কুলের বেতন দেওয়া চলিতে পারিবে।"

ঐ বৎসর পঞ্চম শ্রেণীতে আমরা জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম, সুতরাং অল্পদিনের মধ্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাওয়ায়, আমাকে মধুর অর্থসাহায্য গ্রহণ করিতে হয় নাই। কিন্তু একথা বলিয়া রাখি যে মধুর টাকা গ্রহণ করিতে যে আমি কুণ্ঠিত হইতাম, তাহা নহে, আমি মধুকে এতই আপনার বলিয়া মনে করিতাম।

পঞ্চম শ্রেণীতে জুনিয়র বৃত্তি পাইয়া আমি, মধু ও আমাদের আর কয়েকজন সহপাঠী, আমরা একেবারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলাম। মধুর সহিত আমার সৌহার্দ্য পূর্বের ন্যায় তখন অক্ষুণ্ণ। ইংরাজী কবিতা মধু যাহা লিখিত বা নূতন পড়িত, আমাকে জেদ করিয়া শুনাইত, কিন্তু আচার-ব্যবহারের বিষয়ে আমার সহিত তাহার কোন কথাবার্তা হইত না। সে-সকল বিষয় আমার নিকটে সে সযত্নেই গোপন রাখিত; কখন কথা উঠিলে হাসিয়া উড়াইয়া দিত।

একদিন কলেজে আসিয়া মধু আপন মাথা আমাকে দেখাইয়া বলিল, "দেখ দেখি, কেমন চুল কাটিয়াছি! ইহার জন্য আমার এক মোহর ব্যয় হইয়াছে।" মধু সেদিন ফিরিঙ্গীর মত চুল কাটিয়া আসিয়াছিল—সম্মুখের চুলগুলো বড় ঘাড়ের চুলগুলো ছোট। আমি বলিলাম, "একী করিয়াছ? তোমার পক্ষে এ ঠিক হয় নাই। তুমি একজন জিনিয়াস্ (genius), জিনিয়াস্ যারা, নূতন নূতন বিষয় উদ্ভাবন করিয়া থাকে। তুমি যদি পাঁচ চূড়া, কি সাত চূড়া কি ন'চূড়া কেটে আসতে, তা'হলে যা-হোক একটা নূতন রকম কিছু হ'তো; তা না ক'রে ফিরিঙ্গীর মত চুল কেটে এসেছ। এরূপ নীচ অনুকরণ প্রবৃত্তিটা ভাল নয়।"

আমার কথায় মধু যেন কিছু বিরক্ত হইল বলিয়া বোধ হইল। সেদিন আর আমার কাছে ঘেঁসিয়া বসিল না, একটু তফাতে বসিল। আমার মনে কিছু কষ্ট হইল। কথাটা বলা ভাল হয় নাই, অন্তরে মধু ব্যথা পাইয়াছে। যাহা হউক, আমি মধুর কাছে সরিয়া বসিলাম এবং তাহাকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা পাইলাম।

তাহার পরদিন মধু আর কলেজে আসিল না। অনুসন্ধানে জানিলাম, মধু খ্রীষ্টান হইল, সেদিন আমরা তাহাকে দেখিতে পাইলাম। তাহার পর মধু স্মিত সাহেবের তত্ত্বাবধানে কিছুদিন থাকিয়া বিশপ্স কলেজে গমন করে; তখনও আমি মধুকে মধ্যে মধ্যে দেখিতে গিয়াছি। মধুও আমার সহিত বন্ধুভাবে সম্ভাষণাদি করিয়াছে।

বিশপ্স কলেজে কিছুকাল থাকিয়া মধু মান্দ্রাজ যাত্রা করে। সেখানে যাইয়া আমাকে একখানি পত্র লেখে। পত্রখানির মধ্যে আমার মার কথার উল্লেখ করিয়া মধু লিখিয়াছিল, "আমার প্রণীত 'ক্যাপটিভ লেডী' নামক পুস্তকে যে রাণীর কথা আছে, সেই রাণী তোমার মাকে আদর্শ করিয়া গঠন করা হইয়াছে।"

কিছুদিন পরে মধু আবার দেশে ফিরিয়া আইসে। ঐ সময়ে নর্ম্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ খালি হওয়ায়, ঐ পদে উপযুক্ত লোক বাছিয়া লইবার জন্য একটি প্রতিযোগী পরীক্ষা গৃহীত হয়; মধু ও আমি উভয়েই ঐ পরীক্ষা দিই এবং উক্তপদ আমারই হয়। কিন্তু এখানে একটি কথা বলি, পরীক্ষায় ভাল হইলেই যে প্রকৃত গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা নহে। মধু ও আমি যতবার একসঙ্গে পরীক্ষা দিয়াছি প্রায় সকল বারই আমি উহার উপরে হইয়াছি। কিন্তু তাহা হইলেও তাহার প্রতিভা আমাদিগের মধ্যে অতুল্য ছিল বলিয়াই আমি জানিতাম।

নর্ম্ম্যাল স্কুলের উক্ত পরীক্ষা দিবার সময়ও মধুর বাঙ্গালা ভাষায় তাদৃশ দখল হয় নাই। তখনও সে পৃথিবী লিখিতে 'প্রথিবী' লিখিত; কিন্তু সেই মধু কিছুকাল পরেই, আমার নর্ম্ম্যাল স্কুলে থাকার সময়েই, 'মেঘনাদ-বধ' প্রণয়ন করে এবং মধুর প্রণীত সেই 'মেঘনাদ-বধ' কাব্য

অতি সমাদরে গ্রহণ করিয়া আমি নর্ম্ম্যাল স্কুলে আমার ছাত্রদিগকে পড়াইয়াছি।

মধু আপনার বিদ্যাবুদ্ধি খুবই বেশী মনে করিত। এমন কি সে মধ্যে মধ্যে আমাদের বলিত, "তোমরা আমার জীবনচরিত লিখিও, আমি পৃথিবীর সকল কবির অপেক্ষা বড় কবি হইব।" আমি মধুর এই কথায় হাস্য করিতাম, কিন্তু সে যে একজন অতি প্রতিভাসম্পন্ন যুবা, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম। কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে আমাকে অনেক—অন্যূন কুড়ি লক্ষ ছাত্রের সংস্রবে আসিতে হইয়াছিল, কিন্তু মধুর ন্যায় প্রতিভা আর কাহাতেও কখনও দেখিতে পাই নাই।

॥ অনুশীলনী ॥

সাধারণ প্রশ্ন :—

১। মধুসূদনের সঙ্গে ভূদেববাবুর পরিচয় এবং তাঁদের বন্ধুত্বের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২। মধুসূদনের সম্বন্ধে ভূদেববাবুর মতামত তোমার নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। (ক) "পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মত গোল। কিন্তু ভূদেব, তোমার বাবা একথা স্বীকার করিবেন না।"—বক্তা কে? তিনি কখন একথা বলেছিলেন? 'ভূদেব' কে? 'তোমার বাবা একথা স্বীকার করিবেন না'—বক্তার এরূপ অভিমতের কারণ কি?

(খ) ছুটির পর একেবারে আমার নিকটে আসিয়া "শেক্‌হাণ্ড" করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, তোমার নাম কি, কোথায় বাড়ী তোমার" ইত্যাদি। "শেকহাণ্ড"—শব্দটির অর্থ কি? প্রশ্নকর্তা কে? কাকে প্রশ্ন করেছেন? প্রশ্নকর্তার বর্ণনা দাও। উদ্দিষ্ট ব্যক্তি তারপর কি করলেন?

(গ) কারা কারা জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন? লেখককে

মধুর অর্থসাহায্য গ্রহণ করতে হয়নি কেন? তিনি তারপর কোন্ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন?

(ঘ) "এ কী করিয়াছ? তোমার পক্ষে এ ঠিক হয় নাই।"—বক্তা কে? তিনি কাকে লক্ষ্য করে এরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন? উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কি করেছিলেন? তাঁর সেই কাজে কত ব্যয় হয়েছিল? বক্তা কাজটা 'ঠিক হয় নাই' বলেছেন কেন?

(ঙ) "আমাকে কাপড় দেও, আমি কাপড় পরিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া খাবার খাইব।"—বক্তা কে? কার প্রতি এই উক্তি? কখন এবং কোথায় বসে একথা হচ্ছিল? বক্তার শারীরিক বর্ণনা দাও। বক্তার এরূপ আচরণের জন্য লেখক কি অভিমত পোষণ করেছেন?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ—

১। (ক) "কথাটা বলায়·········এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ।"

—উদ্ধৃতিটি কোত্থেকে নেওয়া হয়েছে? রচনাটি কার? বক্তব্যটি কার? কার উদ্দেশ্যে এই উক্তি? কথাটি কি ছিল? 'দোষ' স্বীকার করার প্রয়োজন হল কেন? 'ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ'—এ কথার তাৎপর্য কি?

(খ) 'এই দিন হইতেই ······বন্ধুত্ব জন্মিল।'

—কে এই উক্তি করেছেন? কোন্ দিনের কথা বলা হয়েছে? কার সঙ্গে কার ঘনিষ্ঠতা জন্মাল? তাদের 'বিশেষ বন্ধুত্ব' সম্পর্কে কি জান বল?

(গ) "কেন ভাই, টাকার জন্য তোমার পড়া বন্ধ হইবে?"

—উক্তিটি কার? 'ভাই' বলে বক্তা কাকে সম্বোধন করেছেন? উদ্দিষ্ট ব্যক্তি তখন কোথায় কোন্ শ্রেণীতে পড়তেন? সেখানে মাসিক বেতন কত ছিল? বক্তা কিভাবে তার সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন?

(ঘ) "তোমরা আমার জীবনচরিত·······বড় কবি হইব।"—কার উদ্দেশ্যে এই বক্তব্য? উক্তিটি কার? 'জীবনচরিত' কি? তিনি কি পৃথিবীর সকল কবি অপেক্ষা বড় কবি হয়েছিলেন? বক্তার প্রতিভা সম্পর্কে বন্ধু কি বক্তব্য করেছেন?

মৌখিক প্রশ্ন ঃ—

১। 'শেকহ্যাণ্ড'—কোন্ দেশীয় শব্দ? (খ) 'মাইকেল মধুসূদন'—মধুসূদনের পুরা নাম কি? (গ) লেখকের সঙ্গে মধুসূদনের কোথায় আলাপ হয়? (ঘ) লেখক হিন্দু কলেজে কোন্ শ্রেণীতে পড়তে আসেন?

(ঙ) পৃথিবীর আকার কেমন ? (চ) তখনকার দিনে কোন্ শ্রেণীতে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল ? (ছ) 'জিনিয়াস' শব্দের আভিধানিক অর্থ কি ? (জ) 'ক্যাপটিভ্ লেডী' কি ? এই বইয়ে রাণীর চরিত্র কার আদর্শ অনুসরণে অঙ্কিত হয়েছে ? (ঝ) 'মেঘনাদ বধ' কি ? রচনাটি কার ? এই প্রবন্ধের লেখক কোন স্কুলে তা পড়াতেন ? (ঞ) 'হেকটর বধ' কি ? কার উদ্দেশ্যে এই বইটি উৎসর্গীকৃত হয়েছিল ? এরূপ উৎসর্গ করার মনোভাবের কারণ সম্পর্কে লেখক কি মন্তব্য করেছেন ?

শব্দার্থ লেখ :—

প্রাক্কাল, জনৈক, প্রশস্ত, তজ্জন্য, প্রগাঢ়, অগত্যা, সৌহার্দ্য, অক্ষুণ্ণ।

সন্ধি বিচ্ছেদ কর :—

জনৈক, গোলাধ্যায়, উজ্জ্বল, অন্যান্য, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, যথেষ্ট, তজ্জন্য, বিস্ময়াপন্ন।

পদান্তর কর :

ব্যথা, গমন, গঠন, পরীক্ষা, গৃহীত, পরিচয়, অবতরণ, ধারণ, উপস্থিত, রচনা।

অশুদ্ধি সংশোধন কর :—

ভুগোল, পৃথীবি, দোস, আকৃষ্ট, উজ্জল, অধ্যবসায়শিল, সম্ভাষন, সতন্ত্র, প্রগাড়।

বিপরীতার্থক শব্দ বল :—

পণ্ডিত, সুশ্রী, সতেজ, আরম্ভ, সুসাধ্য, বদ্ধ, নূতন, তুষ্ট, দেশ, বেশী।

———





স্নেহের নীড়

শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[১৮৭৬ সালে ১৫ই সেপ্টেম্বর হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে শরৎচন্দ্রের জন্ম হয়। তিনি বাংলা সাহিত্যে অপরাজেয় দরদী কথাশিল্পী। শ্রীকান্ত, পণ্ডিতমশাই, পল্লীসমাজ, পথের দাবী, শেষ প্রশ্ন, প্রভৃতি বহু উপন্যাসের তিনি রচয়িতা। ১৯৩৮ সালে ১৬ই জানুয়ারী তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।]

শীতকাল। ঘণ্টা দুই হইল সন্ধ্যা হইয়াছে। কাল প্রভাত হইতেই সিদ্ধেশ্বরীর ভাল করিয়া জ্বর ছাড়ে নাই। আজ এই সময়টা তিনি লেপ মুড়ি দিয়া চুপ করিয়া নির্জ্জীবের মত তাঁহার অতি প্রশস্ত শয্যার একাংশে শুইয়াছিলেন, এবং এই শয্যার উপরেই তিন চারিটা ছেলে-মেয়ে চেঁচামেচি করিয়া খেলা করিতেছিল। নীচে কানাইলাল প্রদীপের আলোকের সুমুখে বসিয়া 'ভূগোল' মুখস্থ করিতেছিল— অর্থাৎ বই খুলিয়া হাঁ করিয়া হুড়োহুড়ি দেখিতেছিল। ও-ধারের শয্যার উপর হরিচরণ শিয়রে আলো জ্বালিয়া চিৎ হইয়া নিবিষ্ট চিত্তে বই পড়িতেছিল। বোধকরি, পাশের পড়া তৈয়ার করিতেছিল, কারণ এত গণ্ডগোলেও তাহার লেশমাত্র ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছিল না। যে শিশুর দলটি এতক্ষণ চেঁচামেচি করিয়া বিছানার উপর খেলিতেছিল, ইহারা সকলেই মেজ কর্ত্তা হরিশের সন্তান।

বিপিন সহসা সরিয়া আসিয়া সিদ্ধেশ্বরীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া

পড়িয়া বলিল,—"আজ আমার ডানদিকে শোবার পালা ? না বড়মা ?" কিন্তু বড়-মা জবাব দিবার পূর্ব্বেই নীচে হইতে কানাই ডাক দিয়া বলিল—"না বিপিন, তুমি না। বড়-মার ডান দিকে আমি শোব যে।' বিপিন প্রতিবাদ করিল,—"তুমি কাল শুয়েছিলে মেজ-দা।'

"কাল শুয়েছিলুম ? আচ্ছা, আজ তবে বাঁ-দিকে!"—যেই বলা, পটলের 'ক্ষুদ্র' মস্তকখানি লেপের ভিতর হইতে উঁচু হইয়া উঠিল, সে এতক্ষণ প্রাণপণে চুপ করিয়া জ্যাঠাইমার বাঁ-দিকে ঘেঁসিয়া পড়িয়াছিল। বে-দখল হইবার সম্ভাবনায় অমন হুড়োহুড়িতে পর্য্যন্ত যোগ দিতে ভরসা করে নাই। সে ক্ষীণকণ্ঠে কহিল,—"আমি এতক্ষণ চুপ করে শুয়ে আছি যে।"

কানাই অগ্রজের অধিকার লইয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিল,—"পটল! বড় ভাইয়ের সঙ্গে তর্ক করো না বলছি। মাকে ব'লে দেব।" পটল বেচারা অত্যন্ত বে-গতিক দেখিয়া এবার জ্যাঠাই-মার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, কাঁদ কাঁদ হইয়া নালিশ করিল,—"বড়-মা, আমি কখন থেকে শুয়ে আছি যে ?" কানাই ছোট ভাই-এর প্রতি স্পর্দ্ধার চোখ পাকাইয়া 'পটল' বলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিয়াই থামিয়া গেল।

ঠিক এই সময়ে ঘরের বাহিরে বারান্দার এক প্রান্ত হইতে শৈলজার কণ্ঠস্বর আসিল,—"ওরে বাপরে! দিদির ঘরে কি ডাকাত পড়েছে ?"

সঙ্গে সঙ্গে কি পরিবর্ত্তন! ও-বিছানায় হরিচরণ পাঠ্য পুস্তকখানা ধাঁ করিয়া বালিশের তলায় গুঁজিয়া দিয়া এবার বোধকরি একখানা অপাঠ্য পুস্তক খুলিয়া বসিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল,—চোখে তাহার জ্বলন্ত মনোযোগ। কানাই বাঁ-দিক্—ডান-দিকের সমস্যার আপাততঃ নিষ্পত্তি না করিয়াই চীৎকার জুড়িয়া দিল,—"যে বিস্তীর্ণ জলরাশি", —আর; সবচেয়ে আশ্চর্য্য ওই শিশুর দলটি। ভোজবাজির মত কোথায় তাহারা যে এক মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইয়া গেল, তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত রহিল না। শৈলজা কলিকাতা হইতে এইমাত্র ফিরিয়া বড় জায়ের জন্য একবাটী গরম দুধ হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। এখন কানাইলালের মহাবিপদ। "সমুদ্রের গভীর কল্লোল

ব্যতীত ঘর সম্পূর্ণ স্তব্ধ। ওদিকে হরিচরণ এমন পড়াই পড়িতে লাগিল যে, তাহার পিঠের উপর দিয়া হাতী চলিয়া গেলেও সে ভ্রূক্ষেপ করিত না। কারণ, ইতিপূর্ব্বে সে "আনন্দমঠ" পড়িতেছিল। তাহার ভবানন্দ-জীবানন্দের কথা ছোট খুড়িমার আকস্মিক শুভাগমনে বিলুপ্ত হইয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, তাহার হাতের কস্‌রতটা তিনি দেখিতে পাইয়াছেন কি না। এবং তাহাই ঠিক অবগত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল।

শৈলজা কানাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"ওরে, ওই বিস্তীর্ণ জলরাশি, এতক্ষণ হচ্ছিল কি?" কানাই মুখ তুলিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত কণ্ঠে চিঁ চিঁ করিয়া বলিল,—"আমি নয় মা, বিপিন আর পটল।" কারণ, ইহারাই তাহার বাঁ-দিক ডান-দিকের মোকর্দ্দমায় প্রধান শত্রু। সে অসঙ্কোচে এই দুই নিরপরাধকে বিমাতার হস্তে অর্পণ করিল।

শৈলজা বলিলেন,—"কাউকে ত দেখচি নে, এরা সব পালালো কোথা দিয়ে।" এবার কানাই বিপুল উৎসাহে দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাত বাড়াইয়া বিছানা দেখাইয়া বলিল,—"কেউ পালায়নি মা, সব ঐ লেপের মধ্যে ঢুকেছে।" তাহার কথা ও মুখ-চোখের চেহারা দেখিয়া শৈলজা হাসিয়া উঠিলেন। দূর হইতে তিনি ইহার গলাটাই বেশী শুনিতে পাইয়াছিলেন। এবার, বড়-জাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"দিদি, খেয়ে ফেল্‌লে যে তোমাকে। হাত তোমার না ওঠে, একবার ধমকাতেও পার না? ওরে ওই সব ছেলেরা—বেরো—চল আমার সঙ্গে।"

সিদ্ধেশ্বরী এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন। এখন মৃদুকণ্ঠে ঈষৎ বিরক্তভাবে বলিলেন,—"ওরা নিজের মনে খেলা কচ্চে, আমাকেই বা খেয়ে ফেল্‌বে কেন? না না, আমার সাম্‌নে কাউকে তোর মারধর কর্ত্তে হবে না। যা তুই এখান থেকে,—লেপের ভিতর ছেলেরা হাঁপিয়ে উঠেছে।"

॥ অনুশীলনী ॥

সাধারণ প্রশ্ন ঃ—

১। (ক) সিদ্ধেশ্বরীর চারপাশে ছেলেদের উৎপাতের বর্ণনা দাও।

(খ) শৈলজার উপস্থিতিতে ছেলেদের অসহায় অবস্থার পরিচয় দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ—

১। (ক) বিপিন কে? সিদ্ধেশ্বরীর সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? সে সিদ্ধেশ্বরীকে কি বলেছিল? বিপিনের কথায় কে প্রতিবাদ জানিয়েছিল? সমস্যার সমাধান হল কিভাবে? (খ) "বড়-মা, আমি কখন থেকে শুয়ে আছি যে?"—বক্তা কে? কাকে একথা বলা হয়েছে? 'বড়-মা'—কে? 'বড়-মা' কাকে বলা হয়? প্রসঙ্গটি কি? বিষয়টির পরিণাম কি হল? (গ) 'সে অসঙ্কোচে এই দুই নিরপরাধকে বিমাতার হস্তে অর্পণ করিল।'—'সে' কে? 'দুই নিরাপরাধ'—কারা? 'বিমাতা-টি কে? 'বিমাতার হস্তে অর্পণ' করার তাৎপর্য কি?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ—

১। (ক) "ওরে বাপরে ····· ডাকাত পড়েছে?"

—অংশটি কোন্ গল্পের? লেখক কে? বক্তা কে? 'দিদি' কে? ঘরে ডাকাত পড়ার প্রসঙ্গটি নির্ণয় কর। উদ্দিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে ঘটনার গতি কোন্ দিকে মোড় নিল?

মৌখিক প্রশ্ন ঃ—

১। (ক) বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে কি বলে আখ্যা দেওয়া হয়? (খ) "যে বিস্তীর্ণ জলরাশি"—কোন্ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত? (গ) 'আনন্দমঠ' কি? রচনাটি কার? (ঘ) কানাই, বিপিন, পটলদের বাবার নাম কি?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ—

তাহার — কথা ছোট খুড়িমার — শুভাগমনে বিলুপ্ত হইয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, তাহার হাতের — তিনি দেখিতে পাইয়াছেন কি না। এবং তাহাই ঠিক — না যাওয়া পর্যন্ত তাহার বুকের মধ্যে — করিতে লাগিল।

বাক্য গঠন কর ঃ—

প্রভাত, এতক্ষণ, সহসা, প্রতিবাদ, ব্যতীত।

সন্ধি-বিচ্ছেদ কর :—

অত্যন্ত, জলন্ত, মনোযোগ, আশ্চর্য, অন্তর্হিত, শুভাগমনে।

পদান্তর কর :

সন্ধ্যা, প্রশস্ত, ভূগোল, অধিকার, পরিবর্তন, সম্পূর্ণ, অর্পণ।

বিপরীতার্থক শব্দ লেখ :—

শীত, সন্ধ্যা, ডান, উঁচু, অগ্রজ, গরম, শত্রু, ঈষৎ।

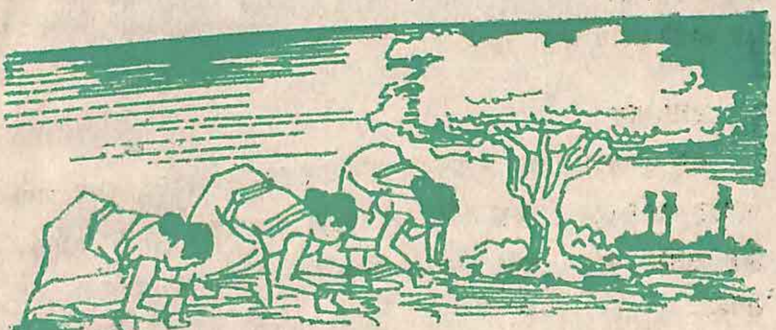
সমনাম শব্দ লেখ :—(প্রত্যেকটির কমপক্ষে তিনটি)

বই, মস্তক, কল্লোল, ঘর, বুক, শত্রু।

শুদ্ধ করে লেখ :—

নির্জিব, ভুগোল, মুখস্থ, কণ্ঠসর, জলন্ত, ব্যতিত, ভ্রূঃক্ষপ, ঈষৎ।

———





[১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই সেপ্টেম্বর বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় চব্বিশ পরগণা জেলার বারাকপুরে ভূমিষ্ঠ হন। শিশুকাল থেকেই তিনি ভবঘুরে প্রকৃতির ছিলেন। তিনি বি. এ. পাশ করে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। তাঁর রচিত 'পথের পাঁচালী', অপরাজিতা, দৃষ্টিপ্রদীপ, আরণ্যক, ইছামতী গ্রন্থসমূহ উল্লেখযোগ্য। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ১লা নভেম্বর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রকৃতি-প্রেমিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'পথের পাঁচালী' হইতে এই অংশটি গৃহীত হইল।]

ভাদ্র মাস।

অপু বৈকাল বেলা বেড়াইতে যাবার সঙ্কল্প করিতেছে, এমন সময় তাহার মা পিছনে ডাকিয়া বলিল—কোথায় বেরুচ্ছিস রে অপু? ... চাল ভাজা আর ছোলা ভাজা ভাজছি—বেরিও না যেন ..এক্ষুনি খাবি—

অপু শুনিয়াও শুনিল না—যদিও সে চাল ছোলা ভাজা খাইতে ভালবাসে বলিয়াই মা তাহার জন্য ভাজিতে বসিয়াছে, ইহা সে জানে—তবু সে কি করিতে পারে?—এতক্ষণ কি খেলাটাই চলিতেছে নীলুদের বাড়ীতে। সে যখন বাহির দরজায় পা দিয়াছে, মার ডাক আবার কানে গেল—বেরুলি বুঝি? ...ও অপু, বারে, দ্যাখো মজা ছেলের! গরম গরম

খাবি—আমি তাড়াতাড়ি ঘাট থেকে এসে ভাজতে লাগলাম—ও অপু-উ-উ—

অপু এক ছুট দিয়া নীলুদের বাড়ী গিয়া পৌঁছিল। অনেক ছেলে জুটিয়াছিল, অপু আসিবার আগেই খেলা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। নীলু বলিল, চল অপু দক্ষিণ মাঠে পাখীর ছানা দেখতে যাবি? অপু রাজী হইলে দুজনে দক্ষিণ মাঠে গেল, ধান ক্ষেতের ওপারেই নবাবগঞ্জের বাঁধা সড়কটি পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা হইয়া যেন মাঠের মাঝখান চিরিয়া চলিয়া গিয়াছে। গ্রাম হইতে এক মাইলের উপর হইবে। অপু অতদূর কখনো বেড়াইতে আসে নাই—তাহার মনে হইল, যেন সমস্ত পরিচিত জিনিসের গণ্ডি ছাড়াইয়া কোথায় কতদূরে নীলুদা তাকে টানিয়া আনিল। একটুখানি পরে সে বলিল—বাড়ী চল নীলুদা, আমার মা বকবে, সন্ধ্যে হয়ে যাবে, আমি একা গাবতলার পথ দিয়ে যেতে পারবো না। তুমি বাড়ী চল—

ফিরতে গিয়ে নীলু পথ হারাইয়া ফেলিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া কাহাদের একটা বড় আমবাগানের ধার দিয়া একটা পথ মিলিল। সন্ধ্যা হইবার তখনও কিছু বিলম্ব আছে, আকাশে আবার মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে —এমন সময় চলিতে চলিতে নীলু হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া অপুর কনুইয়ে টান দিয়া সম্মুখ দিকে চাহিয়া ভয়ের সুরে বলিল—ও ভাই অপু।

অপু সঙ্গীর ভয়ের কারণ বুঝিতে না পারিয়া—কিরে নীলুদা? পরে সে চাহিয়া দেখিল, যে সুঁড়ি পথটা দিয়া তাহারা চলিতেছিল, তাহা কাহাদের উঠানে গিয়া শেষ হইয়াছে - উঠানে একটা ছোট চালাঘর ও একটা বিলাতী আমড়ার গাছ। অপু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বে নীলু ভয়ে বলিয়া উঠিল—আতুড়ী ডাইনীর বাড়ী!

অপুর মুখ শুকাইয়া গেল.... আতুড়ী ডাইনীর বাড়ী...সন্ধ্যাবেলা কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে তাহারা! কে না জানে যে ওই উঠানের গাছে চুরি করিয়া বিলাতী আমড়া পাড়িবার অপরাধে ডাইনীটা জেলে-পাড়ার এক ছেলের প্রাণ কাড়িয়া লইয়া কচুর পাতায় বাঁধিয়া জলে

ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, পরে মাছে তাহা খাইয়া ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে বেচারার আমড়া খাইবার সাধ জন্মের মত মিটিয়া যায়! কে না জানে, সে ইচ্ছা করিলে চোখের চাহনিতে ছোট ছেলেদের রক্ত চুষিয়া খাইয়া তাহাদের ছাড়িয়া দিতে পারে, যাহার রক্ত খাওয়া হইল, সে কিছু জানিতে পারিবে না; কিন্তু বাড়ী গিয়া খাইয়া দাইয়া সে বিছানায় শুইবে আর পরদিন উঠিবে না! কতদিন শীতের রাতে লেপের তলায় শুইয়া দিদির মুখে আতুড়ী ডাইনীর গল্প শুনিতে শুনিতে সে বলিয়াছে—রাত্রিতে তুই ওসব গল্প বলিস্‌নে দিদি, আমার ভয় করে,—তুই সেই কুঁচবরণ রাজকন্যের গল্পটা বল দিকি!

ঝাপ্‌সা দৃষ্টিতে সে সম্মুখে চাহিয়া দেখিতে গেল বাড়ীতে কেহ আছে কি না......এবং চাহিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত শরীর যেন জমিয়া হিম হইয়া গেল......বেড়ার বাঁশের আগড়ের কাছে অন্য কেহ নয়, একেবারে স্বয়ং আতুড়ী ডইনীই তাহাদের · এমন কি যেন শুধু তাহারই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া!.....

যাহার জন্য এত ভয়, তাহাকে একেবারে সম্মুখেই এ-ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অপুর সামনে পিছনে কোন দিকেই পা উঠিতে চাহিল না।

আতুড়ী বুড়ী ভুরু কুঁচ্‌কাইয়া, তোবড়ানো গালটা যেন আরও ঝুলাইয়া ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার ভঙ্গিতে মুখটা সামনের দিকে একটু বাড়াইয়া দিয়া, পায়ে পায়ে তাহাদের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল। অপু দেখিল, সে ধরা পড়িয়াছে, কোন দিকেই আর পালাইবার পথ নাই—যে কারণেই হউক ডাইনীর রাগটা তাহার উপরই—এখনই তাহার প্রাণটি সংগ্রহ করিয়া কচুর পাতায় পুরিবে।

মুখের খাবার ফেলিয়া, মায়ের ডাকের উপর ডাক উপেক্ষা করিয়া সে যে আজ মায়ের মনে কষ্ট দিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহার ফল এই ফলিতে চলিল! সে অসহায়ভাবে চারিদিকে চাহিয়া বলিল—আমি কিছু জানিনে—ও বুড়ী পিসি আমি আর কিছু করবো না

আমায় ছেড়ে দাও, আমি ইদিকে আর কক্ষনো আসব না—আজ ছেড়ে দাও, ও বুড়ী পিসি।

নীলু তো ভয়ে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল, কিন্তু অপুর ভয় এত হইয়াছিল যে, চোখে তাহার জল ছিল না।

বুড়ী বলিল—ভয় কি মোরে, ও বাবারা? মোরে ভয় কি?... পরে খুব ঠাট্টা করা হইতেছে ভাবিয়া হাসিয়া বলিল, মুই কি ধরে নেবো খোকারা? এস মোর বাড়ীতে এস—আমচুর দেবা নি এস—

আমচুর!...ডাইনী বুড়ী ফাঁকি দিয়া ভুলাইয়া বাড়ীতে পুরিতে চাহিতেছে—গেলেই আর কি! ..ডাইনীরা রাক্ষসীরা যে এ-রকম ভুলাইয়া ফাঁদে ফেলে এ-রকম কত গল্প তো অপু তাহার মার মুখে শুনিয়াছে।

এখন সে আর কি করে!... উপায়?

বুড়ী তাহার দিকে আরও খানিক আগাইয়া আসিতে আসিতে বলিল—ভয় কি, ও মোর বাবা! মুই কিছু বলবো না, ভয় কি মোরে?

আর কি, সব শেষ! মায়ের কথা না শুনিবার ফল ফলিবার আর দেরি নাই, হাত বাড়াইয়া তাহার প্রাণটা সংগ্রহ করিয়া এখনি কচুর পাতায় পুরিল! প্রতি মুহূর্তেই তাহার আশঙ্কা হইতেছে যে এখনি এ বুড়ী হাসিমুখ বদলাইয়া ফেলিয়া বিকট মূর্তি ধরিয়া অট্টহাসি করিয়া উঠিবে—সেই রাক্ষসী রাণীর গল্পের মত। বনের অজগর সাপের দৃষ্টির কুহকে পড়িয়া হরিণশিশু নাকি অন্যদিকে চোখ ফিরাইতে পারে না, তাহারও চোখ দুটির কুহকমুগ্ধ দৃষ্টি সেইরূপ বুড়ীর মুখের উপর দৃঢ়নিবদ্ধ ছিল—সে আড়ষ্টকণ্ঠে দিশাহারা ভাবে বলিয়া উঠিল, ও বুড়ী পিসি, আমার মা কাঁদবে, আমায় আজ আর কিছু বোলো না—আমি তোমার গাছে কোনদিন আমড়া নিতে আসিনি—আমার মা কাঁদবে—!

আতঙ্কে সে নীলবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বাড়ী-ঘরদোর, গাছপালা, নীলু, চারিধার যেন ধোঁয়া-ধোঁয়া। কেহ কোনদিকে নাই···কেবল এক-মাত্র সে আর আতুড়ী ডাইনীর ক্রুদ্ধদৃষ্টি-মাখানো একজোড়া চোখ—

আর অনেকদূরে কোথায় যেন তাহার মা, আর চালভাজা খাওয়ার ডাক !...

পরক্ষণেই কিন্তু অত্যধিক ভয়ে তাহার একরূপ মরিয়া সাহস যোগাইল, একটা অস্পষ্ট আর্তরব করিয়া প্রাণভয়ে দিশাহারা অবস্থায় সে সম্মুখের ভাঁট, শেওড়া, রাংচিতার জঙ্গল ভাঙিয়া সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে যেদিকে দুই চোখ যায় ছুটিল......নীলুও ছুটিল তাহার পিছনে পিছনে।...

ইহাদের ভয়ের কারণ কি, বুঝিতে না পারিয়া বুড়ী ভাবিল—মুই মাত্তিও যাইনি ধত্তিও যাইনি– কাঁচা ছেলে, কি জানি মোরে দেখে কেন ভয় পালে সন্দেবেলা ? খোকাডা কাদের ?

অপু যখন বাড়ী আসিল, সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

॥ অনুশীলনী ॥

সাধারণ প্রশ্ন ঃ—

১। দক্ষিণ মাঠে পাখীর ছানা দেখতে গিয়ে অপু যে বিপদে পড়েছিল তার বর্ণনা দাও।

২। ডাইনী বুড়ীর সম্পর্কে অপুর মনে যে সংস্কারবোধ ছিল তার পরিচয় দাও।

৩। আতুড়ী বুড়ীকে অপু তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে ভয় পেয়েছিল কেন ? কেন সে শেষ পর্যন্ত দৌড়ে পালিয়েছিল ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। (ক) অপু বাড়ী থেকে দৌড়ে বেরিয়ে যাবার সময় তার মা তাকে ডাক দিয়েছিলেন কেন ? কেন সে শেষ পর্যন্ত দৌড়ে পালিয়েছিল ?

(খ)—"ও ভাই অপু!"—কথাটি কার ? সে কখন একথা বলেছিল ? বক্তার এরূপ বিস্ময়ের কারণ কি ?

(গ) "ভয় কি, ও মোর বাবা ! মুই কিছু বলবো না, ভয় কি মোরে ?' —বক্তা কে ? 'বাবা' বলে সে কাদের সম্বোধন করেছে ? উদ্দিষ্ট ছেলেদের ভয় পাবার কারন কি ?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ

১। (ক) মুখের খাবার ·····এই ফলিতে চলিল।

—'সে' কে? 'মুখের খাবার ফেলিয়া'—বাক্যাংশটির তাৎপর্য কি? মায়ের ডাক সে উপেক্ষা করেছিল কেন? তার অসহায় অবস্থার বর্ণনা দাও।

(খ) আতঙ্কে সে নীলবর্ণ·········ধোঁয়া—ধোঁয়া।

—'সে' কে? তার আতঙ্কিত হবার কারণ কি? 'বাড়ী-ঘরদোর, গাছ-পালা, নীলু, চারিধার যেন ধোঁয়া-ধোঁয়া'—ব্যাখ্যা দাও। সে তারপর কি করল।

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। (ক) কোন্ মাসের বিকালবেলায় অপু বেড়াতে যাবার সঙ্কল্প করেছিল? (খ) অপুর মা ও দিদির নাম কি? (গ) 'আতুড়ী ডাইনী'র গল্প সে কার কাছে শুনেছে?

শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ

——দৃষ্টিতে সে সম্মুখে চাহিয়া দেখিতে গেল——কেহ আছে কি না ——এবং——সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত শরীর যেন জমিয়া——হইয়া গেল ——বেড়ার বাঁশের——কাছে অন্য কেহ নয়, একেবারে——আতুড়ী ডাইনীই তাহাদের——এমন কি যেন শুধু——দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া!

আতঙ্কে সে —— হইয়া উঠিয়াছে। বাড়ী —— ঘরদোর, গাছপালা, নীলু, চারিধার যেন ——। কেহ —— নাই —— কেবল —— সে আর আতুড়ী ডাইনীর ক্রুদ্ধদৃষ্টি —— মাখানো —— চোখ —— আর অনেকদূরে —— যেন তাহার মা, আর —— খাওয়ার ডাক!

নিম্নরেখ পদগুলোর কোন্‌টি কি পদ নির্ণয় কর ঃ

পরক্ষণেই কিন্তু অত্যধিক ভয়ে তাহার একরূপ মরিয়া সাহস যোগাইল, একটা অস্পষ্ট আর্তরব করিয়া প্রাণভয়ে দিশাহারা অবস্থায় সে সম্মুখের ভাঁট, শেওড়া, রাংচিতার জঙ্গল ভাঙিয়া সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে যেদিকে দুই চোখ যায় ছুটিল ·····নীলুও ছুটিল তাহার পিছনে পিছনে।

———



উদ্ভিদের চুরি-ডাকাতি

গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার

মানুষের সমাজে যেমন ভাল মন্দ দুই রকমেরই লোক আছে, উদ্ভিদের সমাজেও তেমনি ভাল মন্দ দুইই আছে। খবরের কাগজে প্রায় প্রতিদিনই মানুষের চুরি-ডাকতি আর খুন-জখমের খবর থাকে, উদ্ভিদ-জগতেও এমনি খুন-জখম, চুরি-ডাকাতি নিত্য-নিয়তই হইতেছে। তবে উদ্ভিদের এই খুন-জখম আর চুরি-ডাকতির সংবাদটা খবরের কাগজে প্রকাশিত হয় না। উদ্ভিদ-জগতে খুন-জখম, চুরি-ডাকাতি প্রায় সবই হয় নিজেদের খাদ্য সংগ্রহ উপলক্ষ্য করিয়া। ইহাদের একদল আছে, যাহাদের স্বভাবই হইতেছে অন্যের খাদ্য চুরি করিয়া খাওয়া, কিংবা অন্যের বুকের উপর বসিয়া জোর করিয়া প্রথমে তাহার সঞ্চিত খাদ্য শোষণ করা, অবশেষে তাহাকে নিঃসহায়ের মত হত্যা করা। আর একদল উদ্ভিদ আছে, যাহাদের নিষ্ঠুরতার কথা ঠগীর অত্যাচারের কাহিনীকেও ম্লান করিয়া দেয়। ঠগী যাহার আশ্রয়ে মানুষ হইয়াছে তাহাকেই দম আটকাইয়া হত্যা করিয়াছে—এমন বড় একটা শোনা যায় না। কিন্তু এক শ্রেণীর উদ্ভিদ যাহাকে আশ্রয় করিয়া বর্ধিত হয়, তাহাকে ক্রমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলে; তারপর ক্রমশ চাপ দিয়া পিষিয়া গলায় মোচড় দিয়া দম বন্ধ করিয়া মারিয়া ফেলে।

আর একটা বিষয়েও উদ্ভিদ মানুষ হইতে পৃথক। আমাদের সমাজে চোরের ছেলে সাধু হইবার, ডাকাত কিংবা খুনীর ছেলের আদর্শচরিত্র

লোক হইবার কোন বাধা নাই। কিন্তু উদ্ভিদ সমাজে চোরের ছেলেকে চুরি করিয়া এবং খুনীর ছেলেকে ডাকাতি এবং খুন করিয়াই জীবন কাটাইতে হইবে। এ স্বভাব তাহাদের বংশগত, রক্তগত, চরিত্রগত। কথায় বলে, স্বভাব না যায় মলে, ইজ্জৎ না যায় ধুলে!—উদ্ভিদ সম্বন্ধে এই প্রবাদবাক্যটি যত খাটে, অন্যের বেলায় তত খাটে না। এই প্রকার অসাধু চরিত্রের উদ্ভিদের কথা তোমাদের সকলেরই পরিচিত স্বর্ণলতাকে দিয়া আরম্ভ করিব।

স্বর্ণলতা লতাগাছ। ইহার কাঁচা সোনার মত দেহের বর্ণই ইহাকে নাম দিয়াছে স্বর্ণলতা। এই সোনার বর্ণ আর দুর্বল দেহের জন্যই স্বর্ণ-লতার সর্বনেশে স্বভাবের কথা ভুলিয়া অন্য গাছ ইহাকে আশ্রয় দেয়। বীজ হইতে স্বর্ণলতা যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন না থাকে তাহার শিকড়, না থাকে সবুজ পাতা; থাকে কেবল একটুকরো সোনার বরণ সরু দেহ। সেই দেহ লইয়া সে একবার এদিক-ওদিক মাথা হেলাইয়া দেখিয়া লয়, কোনদিকে তাহার আশ্রয় মিলিবে। আবার যে-সে আশ্রয় হইলে তাহার চলিবে না। সবুজ পাতাওয়ালা গাছ চাই, যে উহার জন্য আহার তৈয়ারী করিতে পারিবে। এরকম আশ্রয় যদি সহজেই মিলিল, তবে শিশু স্বর্ণলতা বাঁচিয়া গেল, আর যদি না মিলিল—তবে সে অকালেই মরিল।

একটা ডুরান্টা গাছের কাছেই একটি স্বর্ণলতার শিশু জন্মিয়াছিল। জন্মিয়া মাথা ঘুরাইয়াই নিকটে সে ঐ ডুরান্টা গাছটাকে দেখিল। আস্তে আস্তে তাহার নিকটে আসিয়া সে বলিল, "বন্ধু, আমি অসহায়, দুর্বল! আমাকে একটু আশ্রয় দাও।" ডুরান্টা তাহাকে আশ্রয় দিল। আশ্রয় পাইয়া সে জড়াইয়া ধরিল। আহা কতই না বন্ধুতা, কতই না ভালবাসা।

তারপর কি করিল জান? ধীরে ধীরে স্বর্ণলতা তাহার বন্ধুর গা জড়াইয়া উপরে উঠিল। পাছে তাহার স্বভাবের ও উদ্দেশ্যের কথা জানিতে পরিয়া ডুরান্টা বাতাস কিংবা অন্য কাহারও সাহায্যে তাহাকে দূর করিয়া দেয়, সেই জন্য স্বর্ণলতা কি করিল জান? নিজের দেহ হইতে

এক প্রকার মূল বাহির করিয়া আশ্রয়দাতার শরীরের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া তাহার শরীরের সহিত নিজেকে বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। ইহার পর মাটির সহিত সে আর কোন সম্বন্ধ রাখিল না। ডুরান্টা তখন উপায়হীন, তাড়াইবার আর কোনো সামর্থ্যই তাহার আর তখন নাই। ইতোমধ্যে স্বর্ণলতা তাহার মাথায় চড়িয়া বসিয়াছে। ডুরান্টার বুকের ভিতর যেখানে প্রাণধারণের জন্য খাবার ও জল থাকে সেইখানে চোষকমূল পাঠাইয়া তাহার আশ্রয়দাতা বন্ধুর খাদ্য ও জল শোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এরকম করিয়া ঘাড়ের উপর চাপিয়া বসিয়া খাবার শোষণ করিলে মধ্যবিত্ত বন্ধু আর কতদিন বাঁচিবে! কিছুদিন পরে দেখা গেল খাদ্যাভাবে আর স্বর্ণলতার চাপে ডুরান্টার প্রাণান্ত হইল। বেচারা অতিথিকে বন্ধুভাবেই আদর দিয়া যতদিন পারিল সেবা করিল, পরে প্রাণ পর্যন্ত দিল।

স্বর্ণলতার সোনার বর্ণ দেহ তোমরা তবুও দেখিতে পাও। বেণে-বউ-এর সে বালাইও নাই। বউমানুষের কি বাহির হইতে আছে? তাই তিনি লজ্জায় মাটির নীচে বেগুন তামাক পোস্ত সরষে প্রভৃতি গাছের শিকড়ের মধ্যে প্রায় অশরীরী অবস্থায় বাস করেন, লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া আত্মগোপন করিয়া চুরি-ডাকাতি খুন-জখমের কাজটা চালাইয়া যান; যে গাছকে আশ্রয় করেন, তাহারই শিকড় হইতে তাহারই প্রস্তুত খাদ্য চুরি করিয়া খান। তারপর বংশরক্ষা করিবার জন্য একটি বেশ মোটাসোটা মঞ্জরী-দণ্ড মাটি ভেদ করিয়া উপরে পাঠান। তখন ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

তোমরা পরগাছা দেখিয়াছ। পরগাছাও পরজীবী তবে ইহারা অনেকটা সভ্য এবং দরকার হইলে কিছু কিছু খাদ্য আশ্রয়দাতাকেও সময় সময় দিয়া থাকে। আম, জাম, শিমূল প্রভৃতি গাছের উপরে ইহাদিগকে দেখা যায়। যে গাছকে ইহারা অশ্রয় করে, তাহার পাতার সহিত ইহাদের পাতা মিশিয়া থাকে বলিয়া অনেক সময় ইহাদিগকে ধরা যায় না। কিন্তু শিমূল প্রভৃতি গাছের পাতা যখন শীতকালে ঝরিয়া যায়, তখন ইহাদিগকে চিনিতে আর কষ্ট হয় না। পাখী

ফল খাইয়া এ-গাছে সে-গাছে বিষ্ঠা ত্যাগ করিলে এক গাছের বীজ অন্য গাছের উপর পড়ে। ইহারই ফলে জন্ম লয় পরগাছারা। কিংবা বাতাসে এক গাছের বীজ অন্য কোন বড় গাছের ডালের উপর উড়িয়া গিয়া পড়িলেও পরগাছা জন্ম লইয়া থাকে। জন্ম লইয়াই ইহারা ইহাদের চোষকমূল আশ্রয়দাতার শরীরের মধ্যে ঢুকাইয়া খাদ্য ও জল আহরণ করে।

ইহারা পরজীবী হইলেও নিষ্ঠাবতী,—স্বপাকে খান, পরের রান্না করা খাদ্য স্পর্শও করেন না। দেহে ইহারা সবুজ পাতা ধারণ করেন, আর যাহার ঘাড়ে চড়িয়াছেন তাহার নিকট হইতে জল ও খাদ্যদ্রব্য শোষণ করিয়া নিজেদের দেহের সবুজ পাতার মধ্যে আনেন। তারপর সূর্যের তাপে তাহাকে রান্না করিয়া নিজের খাদ্য নিজে প্রস্তুত করেন ও তাহা খাইয়া জীবন ধারণ করেন। শীতকালে পাতা ঝরিয়া গেলে শিমূল গাছের মত আশ্রয়দাতাকে ইহারা দয়া করিয়া কিছু কিছু খাদ্য দিয়াও থাকেন।

বটগাছ জীবজন্তু পাখী মানুষকে আশ্রয় দেন, ছায়া দান করেন। এই বটগাছেরই অতি বৃদ্ধ এক প্রপিতামহের নীচে বুদ্ধদেবের বোধিলাভ হইয়াছিল—বুদ্ধ অহিংসামন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। সেই বটগাছ কিন্তু মোটেই অহিংস নহেন। সুযোগ পাইলেই ঠগীর মত ইনি ব্যবহার করিয়া থাকেন,—অন্যকে শোষণ করিয়া বাঁচেন, অন্য গাছকে পিষিয়া মারিয়া ফেলিয়া থাকেন। পুরাতন বাড়ীর ছাদে, পুরাতন মন্দির, মসজিদ অথবা গির্জার মাথাতেও ইহারা জন্মিয়া থাকেন। তারপর ধীরে ধীরে শিকড় চালাইয়া আশ্রয়দাতা পুরাতন বাড়ী অথবা মন্দির, মসজিদ ও গির্জাটিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া তবে ছাড়েন।

খেজুর ও তাল গাছের গায়ে ধূলা-বালি জমে। সেইখানে পাখী বটগাছের ফল খাইয়া বিষ্ঠা ত্যাগ করিল। কালক্রমে সেইখানে জল বাতাস পাইয়া বটের শিশু জন্মগ্রহণ করিল। যতই সে বড় হইতে লাগিল, ততই যাহার কোলে মানুষ হইতেছিল তাহারই গা বাহিয়া মাটির দিকে শিকড় চালাইতে আরম্ভ করিল। ক্রমে সেই শিকড়গুলি তাহাকে বেড়াজালে ঘিরিল। তারপর ক্রমশঃ তাহাকে পিষিয়া মারিয়া ফেলিল।

এই প্রকারে বাল্যের আশ্রয়দাতাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া তাহারই জায়গায় দাঁড়াইয়া থাকে সাধু বটগাছ।

চন্দনগাছ দেখিয়াছ? অতি প্রাচীন কাল হইতে চন্দন আমাদের দেশে প্রসাধনের উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। চন্দন ভিন্ন কোন পূজাই হয় না। এমন যে চন্দন—সেও চোর। উপরে অতি ভাল মানুষ। কিন্তু মাটির অন্ধকারে অন্য গাছের শিকড়ের মধ্যে নিজের চোষকমূল চালাইয়া খাদ্যের উপকরণ সে সংগ্রহ করে। মানুষের সমাজেও দিনে সাধু রাতে চোর—এমন লোকের অভাব নাই।

॥ অনুশীলনী ॥

সাধারণ প্রশ্ন ঃ—

১। মানুষের সমাজে যেমন ভাল মন্দ দুই রকমেরই লোক আছে, উদ্ভিদের সমাজেও তেমনি ভাল মন্দ দুই-ই আছে—'উদ্ভিদের চুরি-ডাকাতি' প্রবন্ধ অবলম্বনে তা প্রমাণ কর।

২। স্বর্ণলতাকে আশ্রয় দিয়ে অন্য গাছের কি পরিণাম ঘটেছে তা বল।

৩। বেনেবউ, পরগাছা, বটগাছ, চন্দনগাছ কি উপায়ে অন্যকে শোষণ করে জীবনধারণ করে বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ—

১। (ক) 'আর একটা বিষয়েও উদ্ভিদ মানুষ হইতে পৃথক।'—বিষয়টি কি? দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ কর।

(খ) "বন্ধু আমি অসহায়, দুর্বল! আমাকে একটু আশ্রয় দাও।"—বক্তব্যটি কার? বন্ধুই বা কে? বক্তার অসহায়তা ও দুর্বলতা সম্বন্ধে কি জান? পরবর্তীকালে আশ্রয়প্রার্থী আশ্রয়দাতার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করে?

(গ) 'বউ মানুষের কি বাহির হইতে আছে?'—এই 'বউ মানুষ'টি কে? তার আচরণ সম্পর্কে কি জান?

(ঘ) 'পরগাছা' কাদের বলা হয়? এদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে কি জান বল?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ

১। (ক) 'স্বভাব না যায়……ধুলে।'

—উদ্ধৃতিটি কোন্ প্রবন্ধের অন্তর্গত? রচয়িতা কে? উক্ত প্রবাদ বাক্যটির অর্থ কি? প্রসঙ্গ নির্ণয় ক'র। প্রমাণ পরিধিতে বাক্যটির স্বরূপ নিরূপণ কর।

(খ) বেচারা অতিথিকে ···· প্রাণ পর্যন্ত দিল।

—কে, কিভাবে কার সেবা করে? 'অতিথি'—শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে কেন? 'পরে প্রাণ পর্যন্ত দিল'—কথাটির সত্যতা নির্ধারণ কর।

(গ) এই প্রকারে বাল্যের ···· সাধু বটগাছ!

—'প্রকার' কথার অর্থ কি? 'প্রকার'টি কেমন? 'বাল্যের আশ্রয়দাতা কে? তাকে বটগাছ কিভাবে হত্যা করে তার বর্ণনা দাও। বটগাছের আগে 'সাধু' বিশেষণ প্রয়োগের কোন তাৎপর্য আছে কি?

(ঘ) মানুষের সমাজেও······অভাব নাই।

—মন্তব্যটি কার? উদ্ভিদের মধ্যে কার ক্ষেত্রে উপরোক্ত উক্তিটি ব্যবহার করা হয়েছে? 'দিনে সাধু রাতে চোর'—কথাটি তার ক্ষেত্রে কতটা প্রযোজ্য তা নিরূপণ কর।

মৌখিক প্রশ্ন ঃ—

১। (ক) 'উদ্ভিদ' কাকে বলা হয়?

(খ) ঠগী কাদের বলা হয়? তাদের অত্যাচারের কাহিনী তোমার জানা আছে কি?

(গ) স্বর্ণলতা দেখতে কেমন?

(ঘ) 'পরগাছা' কি?

(ঙ) 'পরজীবী' কাকে বলে?

(চ) পরগাছাদের জন্ম কিভাবে হয়?

(ছ) বটগাছ সাধারণতঃ কোথায় কোথায় জন্মায়?

জোড়ায় জোড়ায় শব্দগুলো দিয়ে বাক্য গঠন কর ঃ—

চুরি-ডাকাতি, খুন-জখম, এদিক-ওদিক, যে সে, ধুলা-বালি।

নিম্নরেখ শব্দগুলোর কোন্‌টি কি পদ নির্ণয় কর ঃ—

১। (ক) আস্তে আস্তে তাহার নিকটে আসিয়া সে বলিল, "বন্ধু আমি অসহায়, দুর্বল, আমাকে একটু আশ্রয় দাও।"

(খ) সেই বট গাছ কিন্তু মোটেই অহিংস নহেন।

বিপরীতার্থক শব্দ লেখ ঃ

ভাল, সাধু, আরম্ভ, দুর্বল, অহিংস, পুরাতন, প্রাচীন।

সমনাম শব্দ লেখ ঃ— (প্রত্যেকটির কমপক্ষে তিনটি)

লোক, অঙ্গ, গাছ, বাতাস, খুন, পাখী, মন্দির।



[১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রবোধ কুমার সান্যাল জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কল্লোল যুগের একজন বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনী লেখক। তিনি তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু খুঁজে বেড়িয়েছেন 'ষ্টীমার ঘাটে, চটকলের ধারে, রেল স্টেশনে, বিদেশের ধর্মশালায়, মফস্বলের ওয়েটিং রুমে, তীর্থপথের মেলায়'। তিনি জীবনে বহুবিধ ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন:—শৈশবে অশেষ দুঃখ ও দুর্ভোগ পেয়েছেন, রাজনীতিতে অংশভাগী হয়েছেন, সেনাবাহিনীর কেরাণীবৃত্তি গ্রহণ করেছেন, ছাপাখানার ম্যানেজারের কাজ নিয়েছেন, 'বিজলী' পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন, 'যুগান্তর' পত্রিকার সাময়িকী বিভাগের দায়িত্ব বহন করেছেন। ১৯২৮ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'যাযাবর' প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা—১৫০। তার মধ্যে উপন্যাসের সংখ্যা—৮০। রচনার মধ্যে 'মহাপ্রস্থানের পথে,' 'সরলেরখা,' 'নদ ও নদী,' 'দেবতাত্মা হিমালয়' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৫০টি প্রকাশিত বইয়ের সম্মান-প্রাপ্তিতে আছে ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বর্ণপদক, মতিলাল স্মৃতি পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার প্রভৃতি। এই ভূপর্যটনকারী লেখক ১৯৮৩ সালের ১৭ই এপ্রিল কলকাতার বালিগঞ্জ টেরেসের বাসভবনে চিরনিদ্রার কোলে শায়িত হন।]

দক্ষিণ আমেরিকার আমেজন নদী—সে নদী অদ্ভুত। পৃথিবীর বৃহত্তম ও দীর্ঘতম নদীগুলির অন্যতম হ'ল আমেজন। মাকড়সা যেমন নিজের চারিদিকে জাল বিস্তার করে, তেমনি আমেজন তার শত শত মাইলব্যাপী শাখা-প্রশাখার জালে এক সুবৃহৎ সমতল ভূ-ভাগকে চারিদিক দিয়ে যেন আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। তীরে তীরে তার ভীষণ

অরণ্য, নররক্তলোভী আদিম জাতি, হিংস্র সরীসৃপ ও শ্বাপদ, মারাত্মক কীট-পতঙ্গ, শোণিত-পিপাসু বাদুড়।

কিন্তু ঘরে যাদের মন বসে না, কোন আরামের লোভে বশীভূত হয় না, সেই সব তরুণের প্রাণ ছুটে যেতে চায় সেই পথে, যে পথে আছে দুঃখ, বিপদ অথবা মৃত্যুভয়। দুর্গম দেশ আবিষ্কার করার আনন্দে তাদের বুকের রক্ত নিত্য অধীর উন্মাদনায় থরথর করে। এই রকম একজন তরুণ বালকের, আর তার তরুণ সঙ্গীদের কাহিনী আজ তোমাদের শোনাব।

ছেলেটির নাম ডন। তার বাড়ী ছিল পেরু প্রদেশের এক শহরে। শহরের এক ভূগোল-সমিতির সভ্য ছিল সে। তার নীল দুটি চোখ ছিল অনাবিষ্কৃত পৃথিবীর স্বপ্নে ভরা, তার মন ছুটে চল্‌ত নদী প্রান্তর অরণ্য পর্বত সমুদ্র অতিক্রম ক'রে যেন অজানা কোন্ জগতের দিকে। ডনের ছিল সুন্দর বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য, অটুট সঙ্কল্প, অলস জীবন-যাত্রার প্রতি অসীম বৈরাগ্য। তার প্রাণ কেবলই ছুটে যেত। যেদিকে দুঃখ ও দুর্ভোগ, দুর্গম ও দুর্যোগ, অন্ধকার ও কষ্টসহিষ্ণুতা—সেখানেই সে তৃপ্তি খুঁজে পেত।

এই ডন একদা তার ভাই গ্রেগরী ও আর ছয়জন বিশ্বাসী তরুণকে সঙ্গে নিয়ে আমেজনের পথে বেরিয়ে পড়ে। তাদের চক্ষে ছিল দুর্গমের স্বপ্নাবেশ, তাদের প্রাণের পিপাসা ছিল অদম্য, তাই কোনো বিপদের কথাই তারা ভাবল না। দক্ষিণ আমেরিকার অরণ্যের বিভীষিকা, দিশাহারা আমেজনের রহস্যময় পথ, অনাহার ও মৃত্যুভয়, নরখাদকের আক্রমণ, প্রকৃতির উৎপীড়ন—এসব কিছুই তারা গ্রাহ্য করল না।

কল্পনার আকাশে সোনার স্বপ্নের জাল বুনে বুনে সেই দুঃসাহসী তরুণের দল উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে পাহাড় পর্বত, অতিক্রম ক'রে চলেছে দুর্গম অরণ্য। কোথাও বা বেতবন ও কাঁটা ঝোপের উপর নেমেছে অন্ধ কুয়াসা, তারই মাঝখানে নিজেরা জঙ্গল কাট্‌তে কাট্‌তে পথ তৈরি করতে লাগল। রাতের দিকে গাছের তলায় তারা আশ্রয় নেয়, নরখাদকের ভয়ে আগুন জ্বালাতে না পেরে শীতে তারা ঠক্‌ঠক্ ক'রে

কাঁপে। ওরই মধ্যে আবার আছে সহস্র সহস্র বিষাক্ত ডাশের আক্রমণ। এইভাবে ক্লান্ত দেহে দিনের পর দিন তারা চলতে লাগল।

অরণ্যের ভিতরে অল্পে অল্পে যখন রাত্রির ছায়া নামতে থাকে, ডনের বন্ধুরা যেন দেখতে পায়,—তাদের ঠাকুমাদের কাছে শোনা রূপকথার শত শত প্রেতমূর্তি গাছের ডালে ডালে ঘুরে তাদের যেন অবরোধ করছে,—চারিদিকে যেন ভয়ঙ্করের করাল ছায়া! আবার দেখা যায়, সহসা সেই অরণ্য যেন আপন ভাষায় মুখর হয়ে উঠেছে ; —বানরের চীৎকারে, বন্য জানোয়ারের গর্জনে, নরখাদক পাখীর বিকৃত আওয়াজে এবং বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ ও হিংস্র বাদুড় আর রক্তলোভাতুর মশার ডাকে সেই অরণ্য পরিপূর্ণ। এই পথে কোথায় কি আছে, কোন্ দেশে কোন্ রাজ্য, কোন্ নদীর পর কোন্ নদী—এ সমস্ত খবরই ত' তাদের কাছে অজ্ঞাত। সেই অজ্ঞাতের খবর নেবার জন্যেই ত' তারা বেরিয়ে পড়েছে ঘরের আরাম ছেড়ে!

সতর্ক চক্ষু চারিদিকে মেলে তারা এগিয়ে চলেছে। ভয়, পাছে নরখাদকদের বিষাক্ত তীর জঙ্গল ভেদ ক'রে এসে তাদের শরীর বিদ্ধ করে। কিংবা গাছের উপর থেকে তাদের ঘাড়ে প্যানথর লাফিয়ে পড়ে। চলতে চলতে তাদের জামা-কাপড়ে এমন সব ভয়ানক পিঁপড়ের দল ঢুকে পড়ে যে, তাদের দংশনে মনে হয় জ্বলন্ত লোহার ছুঁচ তাদের শরীরে কে বিঁধিয়ে দিয়েছে। বন্য বাদুড় হাত-পায়ের আঙ্গুল ও কান কেটে নেবার চেষ্টা করে। এছাড়া লতাপাতার কুৎসিত গন্ধে বমি আসে। এমনি ক'রে একমাস কেটে গেল।

নদীর ধারে কাঠকুটো সংগ্রহ ক'রে তারা সব বন্ধু মিলে একটা ভেলা বানাল। অনেক ছোট-বড় নদী পার হ'য়ে চলতে হবে তাদের—তাই ভেলা তাদের অপরিহার্য। আহারের সংস্থান হ'ল বুনো কলা। নদীতে মাছ প্রচুর। কিন্তু সঙ্গে ছিপ কিংবা জাল নেই। তা'ছাড়া তখন নদীতে নদীতে প্রবল স্রোত—মাছ ধরা দুঃসাধ্য। খরস্রোতের ধাক্কায় একদিন হঠাৎ তাদের ভেলাটি গেল ভেঙে। ঢেউয়ের আবর্তে পাক খেয়ে সেই ভেলাটি কোথায় ভেসে চলে গেল। সেই বিপদের

মধ্যে কাঠের তক্তা আঁকড়ে ধ'রে বীর বালকের দল স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধে মাতল। সাঁতার তারা জানত না, সুতরাং হাত ছেড়ে গেলেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এইভাবে রাত্রি প্রভাত হ'ল, নদীর তীরভূমিতে শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায় তারা ঢেউয়ের ধাক্কায় ধাক্কায় গিয়ে পৌঁছল। এমন সময় দূরে একদল বর্বর সহসা তাদের লক্ষ্য করল, বন্য ভাষায় কি যেন চিৎকার ক'রে বলে উঠল। তারপর দেখতে দেখতে কয়েকটা সাংঘাতিক বিষমাখানো তীর তাদের দিকে ছুটে এলো। কি ভাগ্য, একটিও তাদের গায়ে লাগলো না। ওরা দৈবাৎ বেঁচে গেল।

সেই ক্ষুধার্ত বালকেরা সেদিন ঈশ্বরের দিকে চেয়ে বললে,—"পরাজয় স্বীকার করব না, বরং মৃত্যুকে আলিঙ্গন করব।" তাদের সামনে পথের কোন দিশা নেই, সীমা নেই—সৌভাগ্যের সঙ্কেত নেই। কেবল আছে তাদের বজ্রকঠিন প্রাণ। তারা পিছন দিকে না তাকিয়ে, আবার ভেলা তৈরি ক'রে নদীর স্রোতে ভেসে যায়। জানি না, আকাশ থেকে ঈশ্বর সেদিন তাদের স্নেহাশীর্বাদ করেছিলেন কি না।

ভেলা থামিয়ে ঘুমোতে গেলে বন্য মাছি তাদের আক্রমণ করে। শরীরের রক্ত জ্বলে ওঠে। দেখতে দেখতে গায়ের চামড়ায় ঘা হয়। কোনোদিন হয়ত কোথাও তারা বুনো কলাগাছ দেখতে পেলে, ভেলা থামিয়ে অমনি তারা ছুটল নদীর পাড় বেয়ে। লুব্ধ এই আটটি প্রাণী সেগুলি পলকের মধ্যে গ্রাস করল।

চলতে চলতে এরা আবার একদল জংলী নরখাদককে দেখতে পেয়েছিল। তারা যেন একটু ভদ্র। অর্থাৎ, ডনের এই তরুণ-দলকে দেখেও কিছু বল্‌লে না, অরণ্যের মধ্যে তারা গা-ঢাকা দিল। ডনের দল তাদের জন্য নদীর ধারে কিছু উপহার রেখে দিয়ে অন্তরালে রইল। সেই জংলীরা ফিরে এসে সেগুলি পেয়ে খুশি হ'ল। তাদের সঙ্গে ভাব ক'রে ডন একখানা সালতি নৌকা সংগ্রহ করল। খাদ্য না হলেও তাদের চলবে। কিন্তু সালতিটি সকলের আগে দরকার। তরুণের দল সেই সালতি নিয়ে এবার অগাধ নদীর স্রোতে হু হু ক'রে ভেসে চলল।

ডনের নৌকা চলেছে। পাঁচশো মাইল নদী-পথ পেরিয়ে তারা

আমেজনের প্রধান শাখায় এসে উত্তীর্ণ হ'ল। এর আগে এই নদী আর কেউ কোনদিন অতিক্রম করেনি। কত পর্বত-কন্দর, কত জটিল পথ, কত হিংস্র মানুষ ও পশুর আক্রমণ—কিন্তু সমস্তকে অস্বীকার ক'রে ডনের দল এগিয়ে চলল। ক্রমে তারা বিশাল আমেজনের বিপুল প্রবাহের কল্লোল শুনতে পেল। পথের দুর্যোগকে তারা প্রায় জয় ক'রে এনেছে। এবার যাদেরা নদী পেরিয়ে আমেজনের তীরে উঠলেই তারা আহার ও বিশ্রাম পাবে। দুর্ভাগ্য তাদের শেষ হয়ে এসেছে।

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে ডন দেখল আশপাশের পার্বত্য জলস্রোতের ভীষণ আঘাতে, নদীতরঙ্গ আকাশ অবধি উঁচুতে উঠে ভেঙে ভেঙে পড়ছে। কিন্তু তারা হতাশ হ'ল না।

হায়, ভাগ্যের কি কুটিল কটাক্ষ! জলের নীচে পাহাড়ের চোরা গুহার ভয়ঙ্কর আবর্ত তারা কেউ লক্ষ্য করেনি। সহসা তাদের সালতিটি খরস্রোতে ঘুরপাক খেয়ে এক পাহাড়ের কানায় আঘাত করল সাংঘাতিক-ভাবে। সেই ভয়াবহ ক্ষুব্ধ জলস্রোতে তাদের সবাই নদীর তলায় তলিয়ে গেল।

মুহূর্তের মধ্যে সবাই নিশ্চিহ্ন। কিন্তু দেখা গেল, মাত্র দুটি বালক জলের ধাক্কায় পাহাড়ের কিনারা আঁকড়ে ধ'রে কোনরকমে আত্মরক্ষা করেছে। বাকি ছ'জন—ডন সমেত সেই অনন্ত জলরাশির রাক্ষসী গ্রাসের অতল তলে চিরদিনের মত তলিয়ে গেছে।

সেই নিরুপায় বন্ধু দুটি পাহাড়ের কিনারায় আত্মরক্ষা ক'রে কাঁদতে লাগল তাদের দলপতি ডনের জন্য, অন্যান্য সঙ্গীদের জন্য। কয়েকজন ব্রেজিলবাসী সেই বন্ধু দুটিকে দেখতে পেয়ে নিজেদের গ্রামে নিয়ে গেল অসীম সমাদরে।

কিন্তু ডন? সে আজ কোথায়? তার গৌরব আজ কে নেবে? প্রাণ দিয়ে গেল সে একটি নতুন মানচিত্র রচনা করবার জন্যে। তার কীর্তির পদতলে নমস্কার। আজ ডনের আবিষ্কৃত ভূখণ্ডে নতুন সভ্যতার উদয় হয়েছে।

ডন বেঁচে নেই বটে, কিন্তু প্রত্যেক পেরুবাসীর অন্তরের মন্দিরে সে প্রতিষ্ঠিত। বীরদের কোনদিন মৃত্যু নেই।

॥ অনুশীলনী ॥

সাধারণ প্রশ্ন :—

১। দক্ষিণ আমেরিকার দুর্গমে বিপদ কতরূপ তার পরিচয় দাও।

২। ডনের আবিষ্কার ও অভিযান-কাহিনী বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ—

১। (ক) দক্ষিণ আমেরিকায় বৃহত্তম ও দীর্ঘতম নদীটি কি? তার বর্ণনা দাও।

(খ) ডনের বাড়ী কোথায়? তার সম্পর্কে কি জান? তার দুঃসাহসিক অভিযানের সঙ্গী কতজন ছিল?

(গ) 'এমনি ক'রে একমাস কেটে গেল'—কিভাবে তাদের 'একমাস' কেটে গেল তার উল্লেখ কর।

(ঘ) 'কি ভাগ্য, একটিও তাদের গায়ে লাগল না। ওরা দৈবাৎ বেঁচে গেল,'—তাদের গায়ে কি লাগল না? কারা কিভাবে 'বেঁচে গেল' তার কথা বল।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :—

১। (ক) "পরাজয় স্বীকার ···· আলিঙ্গন করব।"

—উক্তিটি কোন্ রচনার অংশবিশেষ? লেখক কে? কারা কিসে 'পরাজয় স্বীকার' করবে না বলেছে? কার উদ্দেশ্যে তারা একথা জানিয়েছে? ঘটনাটির প্রসঙ্গ নির্ণয় কর। 'মৃত্যুকে আলিঙ্গন' করার প্রতিশ্রুতি ধ্বনিত হল কেন?

(খ) ডন বেঁচে নেই ······ মৃত্যু নেই।

—'ডন' কে? 'সে' মরল কেন? 'প্রত্যেক পেরুবাসীর অন্তরের মন্দিরে' প্রতিষ্ঠা পাবার কারণটি নির্ণয় কর। 'বীরদের কোনদিন মৃত্যু নেই'—এ সম্পর্কে তোমার অভিমত কি?

মৌখিক প্রশ্ন :—

১। (ক) ডন কোন্ সমিতির সভ্য ছিল? তার ভাইয়ের নাম কি? (খ) 'প্যানথর' কি? (গ) 'সালতি' কি? (ঘ) 'ব্রেজিলবাসী' কাদের বলা হয়? অভিযাত্রী দু'টির প্রতি তারা কিরূপ আচরণ করেছিল?

শব্দার্থ লেখ ঃ—

নররক্তলোভী, শ্বাপদ, মারাত্মক, অধীর উন্মাদনায়, অটুট সঙ্কল্প, অসীম বৈরাগ্য, অরণ্যের বিভীষিকা, দিশাহারা, উৎপীড়ন, অবশ্যম্ভাবী, দৈবাৎ, অন্তরালে, পর্বত-কন্দর, কুটিল কটাক্ষ, নিরুপায়, আত্মরক্ষা।

বাক্য গঠন কর :—

বশীভূত, বলিষ্ঠ, অদম্য, বিষাক্ত, অজ্ঞাত, কুৎসিত, সংস্থান, লুব্ধ, অগাধ।

শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

কিন্তু — ? সে আজ — ? তার — আজ কে নেবে? প্রাণ দিয়ে গেল সে একটি নতুন — রচনা করবার জন্যে। তার — পদতলে —। আজ ডনের — ভূখণ্ডে নতুন — উদয় হয়েছে।

সন্ধি বিচ্ছেদ কর :—

আচ্ছন্ন, আবিষ্কার, দুর্গম, স্বপ্নাবেশ, সংস্থান, ক্ষুধার্ত, নিশ্চিহ্ন, নমস্কার।

বিপরীতার্থক শব্দ লেখ :—

দেশ, অলস, অন্ধকার, অন্ধ, কুৎসিত, পরাজয়, ভদ্র, জটিল।

পদান্তর কর :—

বিস্তার, ভীষণ, অরণ্য, বিপদ, আবিষ্কার, অতিক্রম, বিকৃত, সতর্ক, বর্বর, স্বীকার, লুব্ধ, সংগ্রহ, পার্বত্য, রচনা।

সমনাম শব্দ লেখ :—(প্রত্যেকটির কমপক্ষে তিনটি)

অরণ্য, সরীসৃপ, পর্বত, বন্ধু, শরীর, ঈশ্বর, মানুষ, নৌকা, নদী।

অশুদ্ধি সংশোধন কর :—

অদ্ভুত, শাপদ, আবিস্কার, অধির, পিপাষা, জলন্ত, সীকার, নমস্কার।

———





[মনোজিৎ বসু (১৯২০-১৯৮২) একজন স্বনামধন্য লেখক। তিনি ১৯৪৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। অতি অল্পবয়স থেকে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন এবং স্বল্পকালের মধ্যে শিশু সাহিত্যিকরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর লেখার ভঙ্গি সরল এবং সুন্দর। গল্পের মণিমালা, মহাজীবনের দীপশিখা, স্বদেশ যাঁদের ভুলবে না, অবনীন্দ্রনাথ, বিশ্বজিৎ বাঙালী, বীরবন্দনা প্রভৃতি তাঁর ছোটদের উপযোগী গ্রন্থাবলী। এ ছাড়া তিনি বহু গল্প, কবিতা, ছড়া, গান, নাটক ও প্রবন্ধ রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এদেশের তরুণদের মনে যে নামটি গভীর একটা উদ্দীপনার সঞ্চার করতো তা হ'লো—'বাঘা যতীন'। তাঁর আসল নামটি ছিল যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু 'বাঘা যতীন' নামেই তিনি বাঙালীদের কাছে সুপরিচিত ছিলেন। তরুণ বয়সে তিনি একবার এক 'রয়াল বেঙ্গল টাইগার'-এর কবলে পড়েন। কিন্তু বিন্দুমাত্র ভীত না হয়ে তিনি একা সেই বাঘের সঙ্গে লড়াই করেন, এবং শেষ পর্যন্ত এক ছোরা দিয়ে বাঘটিকে মেরে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেন। শুধু যে গায়ের জোরেই তিনি সেদিন উদ্ধার পেয়েছিলেন তা নয়; এই ঘটনার মূলে ছিল তাঁর বিরাট প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দুর্জয় সাহস এবং বিনা

যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার না করার সুদৃঢ় সংকল্প। এই গুণাবলীর জন্যই তিনি তাঁর সমকালীন তরুণদের কাছে অনন্যসাধারণ যুবক বলে শ্রদ্ধেয় ছিলেন।

যশোহরের এক অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন সেকালের এক বিশিষ্ট পণ্ডিত মানুষ। চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সাহসিকতার জন্য তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। যতীন্দ্রনাথের মা শরৎশশী দেবী ছিলেন সে যুগের এক খ্যাতিনাম্নী মহিলা কবি। ছেলেবেলা থেকেই যতীন্দ্রনাথ ছিলেন বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য ও মানসিকতার অধিকারী। নিয়মিত খেলাধূলা, ব্যায়ামচর্চা ও সাঁতার কাটার ফলে তাঁর শরীর বেশ মজবুত হয়ে উঠেছিল। তিনি যখন স্কুলের ছাত্র, সেই সময় একবার এক খ্যাপা ঘোড়ার পিছনে পিছনে ছুটে গিয়ে যেভাবে তাকে বাগে এনে শান্ত করেন তা এক বিস্ময়ের ব্যাপার।

ছাত্রাবস্থায় যতীন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। তিনি যখন তৎকালীন বঙ্গীয় সরকারের একজন চাকুরে তখন বছরের অর্ধেক সময় থাকতেন কলকাতায়, বাকী অর্ধেক সময় দার্জিলিঙে। সন্ধ্যার দিকে তিনি যুবক সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘরোয়াভাবে নানারকম আলাপ আলোচনা করতেন। বেশির ভাগ দিন গীতা ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা হ'তো। তাঁর বক্তৃতা শুনে অন্যান্য যুবকেরা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতো। যতীন্দ্রনাথ তাঁদের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের এবং বহু বিদেশী লেখকের রচনা থেকে দেশাত্মবোধক অংশগুলি এমনভাবে প'ড়ে শোনাতেন ও ব্যাখ্যা করতেন যাতে তাঁরা স্বদেশ-জননীকে গভীরভাবে ভালোবাসতে শেখে। দেশের পরাধীনতার জ্বালা যতীন্দ্রনাথকে অহরহ যন্ত্রণা দিত। কী ক'রে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচন করা যায় সেজন্য তাঁর চিন্তার অন্ত ছিল না।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হ'লে, যতীন্দ্রনাথ একদিন হঠাৎ উধাও হয়ে যান। আত্মগোপন ক'রে তিনি দেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সশস্ত্র এক অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। সেই

ব্যাপারে তিনি দেশের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে বিপ্লব সংগঠনের কাজে লিপ্ত হন। কিন্তু সুচতুর ইংরেজ গোয়েন্দারা তাঁকে এক অসতর্ক মুহূর্তে ধ'রে ফেলেন। তাঁর বিরুদ্ধে 'হাওড়া ষড়যন্ত্রের মামলা' আনা হয়। কিন্তু প্রমাণের অভাবে আদালতে সে মামলা টেঁকে না। যতীন্দ্রনাথ মুক্তিলাভ করেন।

সে-সময় ভারতের বিপ্লবীদল পৃথিবীর নানা দেশে তাঁদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের জন্য তাঁদের সাহায্য ও সমর্থন লাভের চেষ্টায় ছিলেন। আমেরিকার জার্মান দূতাবাসের মাধ্যমে স্থির হয় যে, জার্মান সরকার ভারতীয় বিপ্লবীদের অস্ত্র, অর্থ ও সুদক্ষ অফিসার দিয়ে সাহায্য করবেন। জাহাজবোঝাই অস্ত্রশস্ত্র তাঁরা পাঠিয়েও ছিলেন এবং উড়িষ্যার বালেশ্বরের সমুদ্রতীরে সেই জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র খালাস করে আনবার জন্য যতীন্দ্রনাথ একদল নির্ভীক যুবককে সঙ্গে নিয়ে গিয়েও ছিলেন। কিন্তু বৃটিশ শক্তি গোপন সূত্রে সে খবর পেয়ে মাঝ-দরিয়াতেই সেই জাহাজ আটক করে। গোয়েন্দারা তখন যতীন্দ্রনাথকে খুঁজে বার করবার জন্য উঠে পড়ে লাগে।

যতীন্দ্রনাথ তখন সঙ্গীদের নিয়ে বালেশ্বরের বুড়ীবালাম নদীর তীরে এক গভীর অরণ্যে আত্মগোপন ক'রে ছিলেন। তাঁদের ধরবার জন্য ব্রিটিশ পুলিশের সঙ্গে একদল সৈনিকও যায়। গোটা বনই তারা চতুর্দিক থেকে এমনভাবে ঘিরে ফেলে যে, পালাবার আর পথ থাকে না। তখন সশস্ত্র লড়াই শুরু হয়ে যায় দুই দলের মধ্যে। একদিকে মাত্র জনকয়েক সশস্ত্র বাঙালী যুবক, অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারের বিরাট এক সশস্ত্র বাহিনী! কিন্তু বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করবার পাত্র নন স্বাধীনতা-সংগ্রামী যতীন্দ্রনাথ। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ চলে। অপরিসীম মনোবল ও সাহসিকতার সঙ্গে ইংরেজ পুলিশ ও সৈনিকদের আক্রমণ প্রতিহত করেন যতীন্দ্রনাথ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গুলীবিদ্ধ হয়ে বুড়ীবালামের তীরে প'ড়ে যান তিনি। আহত অবস্থায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় বালেশ্বরের সরকারী হাসপাতালে। ঘটনাটি ঘটে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর। পরদিন সকালবেলায় স্বাধীনতা-সংগ্রামী এই বীর বাঙালী হাসপাতালের শয্যাতেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

॥ অনুশীলনী ॥

সাধারণ প্রশ্ন :—

১। (ক) যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

(খ) বুড়ীবালামের তীরে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রিটিশ বাহিনীর কেন যুদ্ধ হয় এবং তার পরিণাম কী হল—তার বিবরণ দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :—

১। (ক) 'বাঘা যতীন'—আখ্যা কে পেয়েছিলেন? তাঁকে এই আখ্যা দেওয়া হয়েছিল কেন?

(খ) যতীন্দ্রনাথের জন্ম কোথায় ও কত সালে হয়েছিল? তাঁর বাবা ও মার নাম কি?

(গ) সরকারী চাকরী করার সময়ে তিনি সন্ধ্যাবেলা কিভাবে কাটাতেন?

মৌখিক প্রশ্ন :—

১। (ক) 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' কোথায় পাওয়া যায়? (খ) ১৮৭৯ ও ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ কি জন্য বিখ্যাত? (গ) 'খ্যাতনাম্নী মহিলা কবি'টি কে? (ঘ) বুড়ীবালাম কি এবং কোথায়? (ঙ) যতীন্দ্রনাথ কোথায় এবং কবে 'শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন'?

শব্দার্থ লেখ :—

বিন্দুমাত্র, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অনন্যসাধারণ, অবস্থাপন্ন, বলিষ্ঠ, মজবুত, খ্যাপা, অনুপ্রাণিত, তৎকালীন, অহরহ, প্রতিনিধি, মনোবল।

বাক্য গঠন কর :—

সুপরিচিত, উদ্ধার, সমকালীন, খ্যাতি, যন্ত্রণা, অস্ত্র, সশস্ত্র।

পদান্তর কর :—

গভীর, পরিচয়, উদ্ধার, বিশিষ্ট, পণ্ডিত, দৃঢ়তা, মোচন, বিপ্লব, নির্ভীক, আহত।

বিপরীতার্থক শব্দ লেখ :—

আসল, সাহসিকতা, পরাধীনতা, সশস্ত্র, সরকারী।

সন্ধি বিচ্ছেদ কর :—

সঞ্চার, উদ্ধার, যতীন্দ্রনাথ, ছাত্রাবস্থায়, অর্ধেক, অন্যান্য, দেশাত্মবোধক।

লিঙ্গান্তর কর :—

তরুণ, যুবক, শ্রদ্ধেয়, খ্যাতনাম্নী, ঘোড়া, সুচতুর, সুদক্ষ।



শ্রীঅরবিন্দ

সত্যরঞ্জন জানা

[যোগী-ঋষির দেশ ভারতবর্ষে বিপ্লবী-ঋষির আগমন খুব সীমিত। বর্তমান প্রবন্ধে লেখক উনবিংশ শতকের বিপ্লবী-সাধক শ্রীঅরবিন্দের পুত জীবনকাহিনী বর্ণনা করিয়া ভারতীয় মনীষীবৃন্দের মধ্যে এক অপূর্ব জীবন-আলেখ্যের প্রতি নিজের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন।]

আধুনিক ভারতবর্ষে ক্ষাত্রশক্তির উদ্গাতা হিসাবে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের পরেই মুক্তিসাধক শ্রীঅরবিন্দের নাম সকলে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করেন।

হুগলী জেলার কোন্নগরের প্রখ্যাত ঘোষ পরিবারে পিতা চিকিৎসক কৃষ্ণধন ঘোষের গৃহ আলো করিয়া স্বভাব-শান্ত যে শিশু ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্ট জন্মগ্রহণ করিলেন, সাত বৎসর বয়স হইতে বিদেশী আবহাওয়ায় পালিত হইয়াও তিনি যে মুক্তিপিয়াসী ভারতীয় ঋষিতে রূপান্তরিত হইবেন ইহা সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস্য ছিল।

অরবিন্দের কৈশোর ও প্রথম যৌবন ইংলণ্ডে অতিবাহিত হয়। এইজন্য মাতৃভাষা শিক্ষা করিবার সৌভাগ্য তিনি তখন লাভ করিতে পারেন নাই। তবে মেধাবী ছাত্র হিসাবে ইংরাজী, গ্রীক, ল্যাটিন

ভাষাতে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াও তাঁহার অন্তরের পিপাসা কখনও উচ্চ সরকারী চাকুরী লাভে লুব্ধ ছিল না। কি এক অলক্ষ্যচারী আকর্ষণ যেন তাঁহাকে কোনদিকে টানিয়া লইয়া যাইত।

ইংলণ্ডে উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বরোদা-রাজ গায়কোয়াড়ের একান্ত অনুরোধে অরবিন্দ বরোদারাজ-সরকারের কার্য গ্রহণ করেন। এই চাকুরী গ্রহণকে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ঘটে। রাজ-সরকারের চাকুরী গ্রহণ অপেক্ষা এই ধ্যানাতুর যুবক অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া বরোদা রাজ কলেজে ইংরেজী অধ্যাপনার কার্য গ্রহণ করেন। পরে এই কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ পদেও উন্নীত হইলেন। বরোদায় অবস্থান কালেই অরবিন্দের জীবনে দ্বিমুখী সংগ্রামের পূর্বাভাস সূচিত হয়। একটি হইতেছে বিপ্লবী আন্দোলনের সংগ্রাম এবং দ্বিতীয়টি আধ্যাত্মিকতাযুক্ত আত্মসংগ্রাম। মহামতি গোখ্‌লে প্রমুখ মহারাষ্ট্রের চিন্তানায়কবৃন্দের সাহচর্য ও ভগিনী নিবেদিতার মাধ্যমে বাংলার বিপ্লবী আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে যেন কোন এক নূতন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দান করিতেছিল। এই বরোদাতেই তিনি সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। ইং ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ গার্হস্থ্য ধর্ম অবলম্বন করিয়া মৃণালিনী দেবীকে বিবাহ করেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ আদেশে বঙ্গদেশ উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে, তখন শ্রীঅরবিন্দ বাঙালী বিপ্লবীবৃন্দের আগ্রহে ও ভগিনী নিবেদিতার পরামর্শে বিপ্লবের পীঠস্থান কলিকাতায় আগমন করেন। শুধু আগমনই নহে, নিপুণ কর্ণধারের মতো বিপ্লব আন্দোলনের দীক্ষা ও শিক্ষায় বাঙালীকে যেন নবপ্রাণে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিলেন। তখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আবেদন ও নিবেদনের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের নিকট কিঞ্চিৎ অনুগ্রহলাভে তৎপর ছিল। অরবিন্দ কংগ্রেসে প্রবেশ করিয়া কংগ্রেসের এই

প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, পরন্তু নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের মত ও পথনির্দেশ করিলেন। ইহাতে তরুণ-বিপ্লবী-বাঙালী সমাজ যেন তাহাদের অভীষ্ট নেতাকে খুঁজিয়া পাইল।

অচিরেই শ্রীঅরবিন্দ রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া মাণিকতলার বোমার মামলায় জড়াইয়া পড়িলেন। এই মামলায় আলিপুরে কারাবাসের মধ্যেই তিনি বাসুদেবের সাক্ষাৎ লাভ করেন। বহু তরুণ বিপ্লবীর ফাঁসি ও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইলেও অরবিন্দ মুক্তিলাভ করিলেন—কারণ প্রমাণাভাব। বিখ্যাত ব্যারিস্টার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বিনা খরচায় তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন—"আজ যিনি অভিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি সামান্য ব্যক্তি নন। মানবজাতির ইতিহাসে এরূপ পুরুষ বিশেষ আসেন নাই, আমরা তাঁহার বিচারের অধিকারী নই।"

বাস্তবিকই দূরদর্শী দেশবন্ধুর উক্তি পরে সত্য হইয়াছিল। কারামুক্তির পর অরবিন্দ কলিকাতা হইতে চন্দননগর চলিয়া গেলেন এবং ইংরেজ সরকারের নিপীড়নের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী উপনিবেশ পণ্ডিচেরীতে গমন করিলেন। ইহার পর দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের ইতিহাস শ্রীঅরবিন্দের যোগজীবন সাধন ও সত্য উপলব্ধির ইতিহাস।

পণ্ডিচেরীতে অবস্থানকালে তিনি ভারতীয় সাধনার শেষ উত্তরাধিকারীরূপে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি-সাধনার মূর্ত প্রতীক হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সাধনা ব্যক্তিগত মুক্তিসাধনা নহে—তাহা লোকহিতায়, জগদ্ধিতায়। লোকহিত সাধনের জন্য তিনি যে দিব্যজীবনের সন্ধান লাভ করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতন। এই পৃথিবীতেই মানবের মুক্তি সম্ভব, তাহার জন্য চাই নিরলসভাবে পরম পুরুষ লাভে ঐকান্তিক আকুলতা। এই পরম পুরুষই মানবের মুক্তিদাতা। আত্মার উৎকর্ষ সাধন এবং অহংভাব বর্জনের উপরেই ব্যক্তি ও সমষ্টিগত সমাজের প্রকৃত কল্যাণ নির্ভর করে। এই

কল্যাণবোধে জাগ্রত পূর্ণ মনুষ্যত্ব (Super Man) লাভই জীবনের চরম লক্ষ্য। এইরূপে সাধক অরবিন্দ জগৎ-জীবন ও অবতারবাদ সম্পর্কে নূতন ভাষ্য দান করিলেন। 'আর্য' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার সাধনলব্ধ-সত্য পৃথিবীর বহু জড়বাদে বিশ্বাসী মনীষীকেও চিন্তাকুল করিয়া তুলিল। পণ্ডিচেরী আশ্রম বিশ্বজনীন ভাবের তীর্থ-ভূমিতে পরিণত হইল।

তাঁহার পরিচালিত 'বন্দে মাতরম,' পত্রিকা যেমন বিপ্লববাদকে এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তেমনি 'কর্মযোগিন' ও 'আর্য' পত্রিকা অধ্যাত্মবাদের নূতন আলোকবর্তিকা। এই সমস্ত পত্র-পত্রিকা ব্যতীত তৎকৃত গীতাভাষ্য, "Life Divine" বা 'দিব্যজীবন', 'The Mother' অতি উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক চিন্তার পরিচয় বহন করে। কেবল বিপ্লববাদ ও দার্শনিকতা নহে, এক অলক্ষ্যচারী উন্নত কবিপ্রাণ তাঁহার মধ্যে অন্তঃশীলা ছিল। তাঁহার সুদীর্ঘ ইংরাজী কাব্য 'Savitri' বা 'সাবিত্রী' অতুলনীয় সাহিত্য-কীর্তি। এতদ্ব্যতীত শ্রীঅরবিন্দ কর্তৃক সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের দেশাত্মবোধক উপন্যাস 'আনন্দমঠের' ইংরাজী অনুবাদ ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে লিখিত চিন্তালব্ধ ইংরাজী প্রবন্ধ, তাঁহার সাধকসত্তার উন্নত পরিচায়িকা।

ঋষি অরবিন্দ সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পণ্ডিচেরীতে থাকিয়া নিজ সাধনলব্ধ-সত্য জগতে প্রচার করিয়াছেন। তবে এ প্রচারণী কোন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নহে। বায়ু যেমন সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, অরবিন্দ-অনুভবের শিক্ষা তেমনি আপন শক্তিতে স্বতঃই ব্যাপ্ত হইয়া চলে। এই মহা যোগজীবনের নির্বাণ ঘটে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে।

স্বদেশী যুগের প্রচণ্ড ঘূর্ণির মধ্যে সন্ত্রাসবাদের পালে ভর করিয়া তরুণ ভারত যখন দেশমুক্তির যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল, তখনই শ্রীঅরবিন্দ সাধক গুরুর মতই তরুণ মুক্তি পিপাসুদিগকে যেমন ক্ষাত্রশক্তিতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন—তেমনি সমগ্র জগতকেও পূর্ণ মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ হইবার পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন। এইজন্য শ্রীঅরবিন্দ

আজ মানব-সাধক অরবিন্দ, এইজন্য ভারতের পণ্ডিচেরী আজ বিশ্বমুক্তি সাধনার যজ্ঞক্ষেত্র।

এস, তাঁহার শুভ আগমনক্ষণে সেই ক্ষত্রিয় সাধক ঋষিকে প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করি।

॥ অনুশীলনী ॥

সাধারণ প্রশ্ন ঃ—

১। কৈশোর ও যৌবনে অরবিন্দ কোথায় কিরূপ শিক্ষা পাইয়াছিলেন ?

২। তাঁহার কর্মজীবন কিভাবে স্থরু হইল ? তিনি ঐ বিশেষ কর্ম গ্রহণ করিলেন কেন ?

৩। কলিকাতায় অরবিন্দের ভূমিকা ও ফলাফল বর্ণনা কর।

৪। পণ্ডিচেরীতে তাঁহার কি রূপ প্রকাশ পাইল তাহা বুঝাইয়া বল।

৫। অরবিন্দ সম্পাদিত পত্রিকাগুলি ও রচিত গ্রন্থগুলির পরিচয় দাও।

ব্যাখ্যা কর ঃ—

(ক) "আমরা তাঁহার বিচারের অধিকারী নই।"

(খ) ইহাতে তরুণ বিপ্লবী বাঙালী সমাজ যেন তাহাদের অভীষ্ট নেতাকে খুঁজিয়া পাইল।

টীকা লিখ ঃ—(নিজেরা ইতিহাস পড়িয়া বা অভিধান দেখিয়া লেখ)। বিবেকানন্দ, ঋষি, ভগিনী নিবেদিতা, মহারাষ্ট্র, বঙ্গভঙ্গ, পণ্ডিচেরী, বন্দেমাতরম্, দেশবন্ধু, জাতীয় কংগ্রেস, স্বদেশী যুগ।

সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ—

প্রত্যাবর্ত্তন, দ্বীপান্তর, যাবজ্জীবন।

পদান্তর কর ঃ—

শ্রদ্ধা, শান্ত, মেধাবী, লুব্ধ, সাধন, অনুগ্রহ।



ভাঙাগড়া প্রকৃতির খেলা, কিন্তু মানুষের খেলা হইতেছে সৃষ্টি। সভ্যতা সৃষ্টির প্রথম হইতেই মানুষ তাহার সৃষ্টির জয়পতাকা উড়াইয়া চলিতেছে।

স্বাধীন ভারতে সৃষ্টি কর্মযজ্ঞের যে গৌরবজনক অধ্যায় সূচিত হইয়াছে—শিল্পনগরী দুর্গাপুর তাহাদের অন্যতম। উড়িষ্যার 'রৌরকেল্লা', মধ্যপ্রদেশের 'ভিলাই'র মতই 'দুর্গাপুর' একটি অন্যতম সৃষ্টিস্তম্ভ। কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতা হইতে ১১৮ মাইল দূরে গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোডের পার্শ্বে অবস্থিত বন-জঙ্গলে আবৃত, শাল জঙ্গলে সুপ্ত ছিল এই সম্ভাবনাময় কেন্দ্রটি। চোর-ডাকাত, ঠ্যাঙাড়ে অধ্যুষিত এই দুর্গাপুর ছিল হিংস্রতার কেন্দ্রস্থল আর ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বরের কুখ্যাত ডিপো। কিন্তু জাগ্রত ভারতের জনশক্তি এবং সর্বোপরি মানুষ গড়ার কারিগর তৎকালীন পশ্চিমবংগের মুখ্যমন্ত্রী স্বর্গত বিধানচন্দ্র রায়ের দূরদৃষ্টিই ইহাকে বর্তমান ভারতের কোলাহলমুখর অন্যতম নগরীতে পরিণত করিয়াছে।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত দুর্গাপুরে দামোদর নদের বাঁধ উদ্বোধন করিবার সময়েই ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মনে দুর্গাপুর শিল্পনগরী স্থাপনের পরিকল্পনা জাগ্রত হয়। পশ্চিমবংগ ও

বিহার জুড়িয়া নিকটবর্তী কয়লা ও লৌহ খনি অঞ্চল, বৃহত্তম বন্দর কলিকাতার সহিত সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সুলভ শ্রমিক প্রাপ্তির সম্ভাবনা লক্ষ্য করিয়া তিনি শিল্পনগরী স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দান করিলেন। সেই পরামর্শের স্বর্ণফসল হইতেছে দুর্গাপুর।

সর্বপ্রথম পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোকচুল্লী স্থাপন, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন ও সাধারণ শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দুর্গাপুরের জন্য চৌদ্দ কোটী একান্ন লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিলেন। ইং ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগত রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র-প্রসাদ এশিয়ার বৃহত্তম কোকচুল্লীটির উদ্বোধন করেন।

পূর্বে আমাদের দেশে বৎসরে তিন-চার লক্ষ টন শক্ত কোক কয়লার ঘাটতি ছিল। দুর্গাপুরের কল্যাণে এখন দৈনিক এক লক্ষ টন শক্ত কোক কয়লার উৎপাদন বাস্তবে রূপায়িত হইতে চলিয়াছে। শুধু শক্ত কোকই নহে, এই কোক উৎপাদন কালে অন্য যে সমস্ত বস্তু উপজাত হিসাবে পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে 'গ্যাস' হইতেছে অন্যতম। এই গ্যাসের সাহায্যে বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন এবং গৃহস্থের রন্ধনাদি কর্মও চলিতে পারে। বর্তমানে দুর্গাপুর হইতে কলিকাতা পর্যন্ত গ্যাস-পাইপের সাহায্যে এই গ্যাস সরবরাহ করিয়া বহু ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন সম্ভব হইয়াছে।

পশ্চিমবংগ সরকারের এই শিল্পোদ্যমের সহিত হাত মিলাইলেন কেন্দ্রীয় সরকারও। পঞ্চাশ কোটী টাকা ব্যয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বৃহৎ যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন এই দুর্গাপুরেই। এতদ্ব্যতীত সোভিয়েট সরকারের সহযোগিতায় স্থাপিত ভারীশিল্পের কারখানা ও সূক্ষ্ম কাচের কারখানা ; জাপানের সহযোগিতায় মিশ্র ইস্পাতের কারখানা দুর্গাপুরকে একটি আন্তর্জাতিক শিল্পনগরীতে পরিণত করিয়াছে।

উপরিউক্ত বিভিন্ন কায়খানা ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা ইহার অন্যতম শিল্পনির্দেশিকা। তেরোটি

বৃটিশ কোম্পানী সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও নির্দেশনায় কেন্দ্রীয় সরকারের 'ইণ্ডিয়ান স্টিল ওয়ার্কস কোম্পানী' ইস্পাত কারখানায় পূর্ণ উদ্যমে ইস্পাত উৎপাদন করিতেছেন। বৎসরে দশ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদন ইহাদের লক্ষ্য।

সরকারী প্রচেষ্টার সহিত বেসরকারী প্রচেষ্টাও এই শিল্পনগরীতে তালে তালে পা ফেলিয়া চলিতেছে। 'দি এ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানী', 'তাপসহ ইষ্টক নির্মাণ কোম্পানী' স্ব স্ব প্রচেষ্টায় সিমেন্ট কারখানা ও ইট তৈরীর কারখানা স্থাপন করিয়া সমৃদ্ধ ভারত গঠনের মহৎ ব্রতে আত্মনিয়োগ করিয়াছে।

দুর্গাপুর পরিকল্পিত নগরী। সেইজন্য ইহা সজ্জিত ও পরিচ্ছন্ন। সারি সারি সৌধমালা, প্রশস্ত রাজপথ, নির্দিষ্ট হাটবাজার, পয়ঃপ্রণালী, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, এবং চিকিৎসাব্যবস্থা যেরূপ ভাবে সাধারণ অধিবাসীদিগকে এই নগরীর নাগরিক হইতে আহ্বান জানায়, অনুরূপভাবে শ্রমিক কল্যাণের জন্য বিভিন্ন আমোদ-প্রমোদ ব্যবস্থা, খেলাধূলার ব্যবস্থা, চলচ্চিত্র প্রদর্শনেরও সুবন্দোবস্ত রহিয়াছে। সূর্যোদয়ে শিল্পকারখানাগুলির বয়লার হইতে নির্গত কালো কালো ধোঁয়া সমগ্র নগরীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে না। সন্ধ্যায় প্রশস্ত রাজপথে সুসজ্জিত বৈদ্যুতিক আলোকমালা যেন মায়ার রাজ্য সৃষ্টি করে।

অদূরে অবস্থিত দামোদরের বাঁধ ও জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র দুর্গাপুর নগর পরিকল্পনার সহিত যুক্ত হইয়া এই শিল্পনগরীর সীমা নির্ধারণ করিতেছে। প্রায় তিন লক্ষ লোকের আবাসস্থল, হাজার হাজার বেকারের কর্মসংস্থানের কেন্দ্রভূমি দুর্গাপুরকে কেহ আর গণ্ডগ্রাম বলিয়া চিহ্নিত করিতে পারিবেন না। কোন বিদেশী পর্যটক আসিলে দেখিতে পাইবেন দুর্গাপুরের হস্তে আন্তর্জাতিক মৈত্রীর রাখীবন্ধন আর শুনিতে পাইবেন তাহার কণ্ঠে যন্ত্রদানবগুলির ঘর্ঘরমন্ত্রে স্বাধীন ভারতবর্ষের জীবনোচ্ছ্বাসের অমর সৃষ্টি-সংগীত।

॥ অনুশীলনী ॥

সাধারণ প্রশ্ন ঃ—

১। দুর্গাপুরের অবস্থান ও আদিরূপ সম্বন্ধে কি জান ?
২। কি কি কারণে দুর্গাপুর শিল্পনগরী হইতে পারিল ?
৩। দুর্গাপুরে স্থাপিত শিল্পগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৪। 'দুর্গাপুর পরিকল্পিত নগরী' উক্তিটি বুঝাইয়া বল।
৫। বিদেশী পর্যটক এই নগরে আসিলে কি কি অনুভব করিবেন ?

টীকা লিখ ঃ—

রৌরকেল্লা, ভিলাই, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, ঠ্যাঙাড়ে ডি. ভি. সি., গ্যাস, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

ব্যাখ্যা লিখ ঃ—

(ক) ভাঙাগড়া প্রকৃতির খেলা, কিন্তু মানুষের খেলা হইতেছে সৃষ্টি।
(খ) দুর্গাপুরের হস্তে আন্তর্জাতিক মৈত্রীর রাখীবন্ধন।

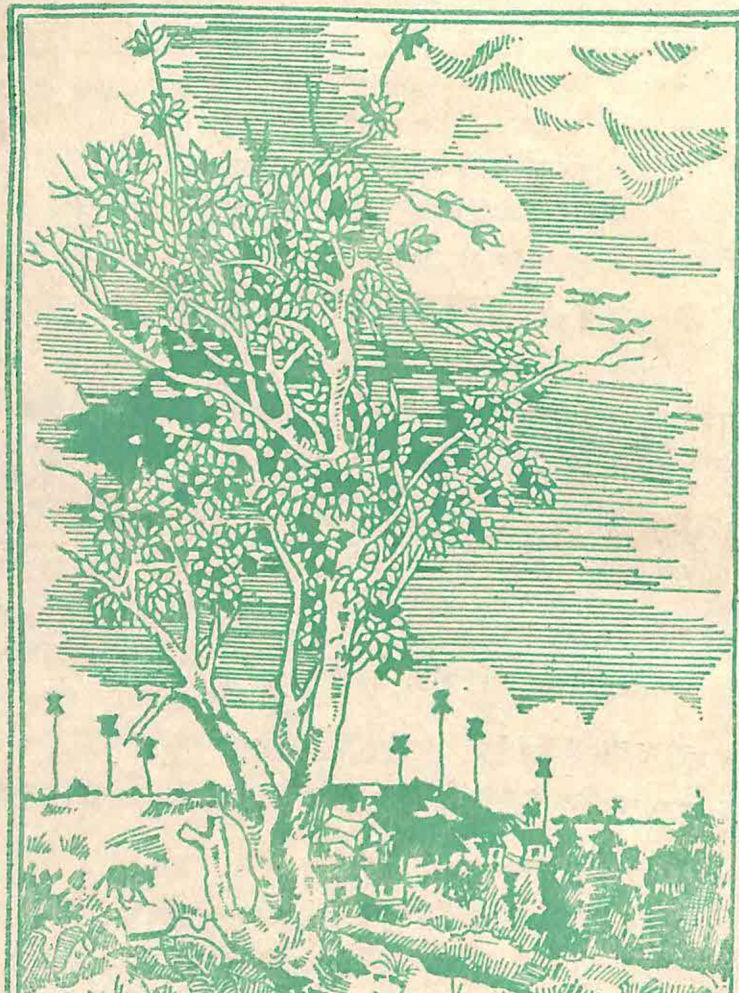
সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ—

চলচ্চিত্র, পরিচ্ছন্ন, এতদ্ব্যতীত, শিল্পোত্তম।

বাক্য রচনা কর ঃ—

সুপ্ত, অধ্যুষিত, উদ্বোধন, উপজাত, ভারীশিল্প।





পদ্যাংশ



[আনুমানিক ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলার শান্তিপুর ফুলিয়ায় বাংলার আদি-কবি কৃত্তিবাস ওঝার জন্ম হয়। পিতা বনমালী মাতামহ 'মুরারি' ওঝা। সম্ভবতঃ রাজসাহীর 'রাজা গণেশের' পৃষ্ঠপোষকতায় কবি সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনা করেন। তিনি প্রায় আশি বৎসর বেঁচে ছিলেন বলে অনুমান করা হয়।]

আজ্ঞা পেয়ে রথ তবে জোগায় সারথি,
ভরত আনিতে রামে যান শীঘ্রগতি।
চিত্রকূট পর্ব্বতে আছেন রঘুবর,
শুনিয়া ভরত তথা হন অগ্রসর।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর জনকের বালা,
বসতি করেন নির্ম্মাইয়া পর্ণশালা।
হেনকালে ভরত শত্রুঘ্ন দীনবেশে,
শ্রীরামের আশ্রমেতে যাইয়া প্রবেশে।
গলবস্ত্র ভরত নয়নে বহে নীর ;
তীর্থ-পর্য্যটনে অতি মলিন শরীর।

পড়িলেন শ্রীরামের চরণ-কমলে,
আনন্দে শ্রীরাম তাঁ'রে লইলেন কোলে।
ভরত কহেন ধরি' রামের চরণ—
"কার বাক্যে রাজ্য ছাড়ি" বনে আগমন ?
বামা-জাতি স্বভাবতঃ বামা বুদ্ধি ধরে,
তাঁর বাক্যে কে কোথা গিয়াছে দেশান্তরে ?
অপরাধ ক্ষমা কর ; চল প্রভু দেশ ;
সিংহাসনে বসিয়া ঘুচাও মনঃক্লেশ।
অযোধ্যাভূষণ তুমি অযোধ্যার সার,
তোমা বিনা অযোধ্যা দিবসে অন্ধকার
চল প্রভু অযোধ্যায়, লহ রাজ্যভার ;
দাসবৎ কর্ম্ম করি আজ্ঞা অনুসার।
শ্রীরাম বলেন, "তুমি ভরত পণ্ডিত,
না বুঝিয়া কেন বল, এ নহে উচিত।
মিথ্যা অনুযোগ কেন কর বিমাতায়,
বনে আইলাম আমি পিতার আজ্ঞায়।
চতুর্দ্দশ বৎসর পালিয়া পিতৃবাক্য,
অযোধ্যা যাইব আমি, দেখিবা প্রত্যক্ষ।"

॥ অনুশীলনী ॥

সাধারণ প্রশ্ন ঃ—

১। কবিতাটির 'সারমর্ম' লেখ।
২। রামচন্দ্র ও ভরতের 'কথোপকথণের' সার সংকলন কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ—

১। রামের প্রতি ভরতের অনুযোগ লিপিবদ্ধ কর।
২। ভরতের অনুযোগের উত্তরে রামচন্দ্রের বক্তব্য কি ছিল ?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ—

১। (ক) গলবস্ত্র ভরত ······· কোলে।

—কবিতাটির কার লেখা? কবিতাটির নাম কি? 'ভরত' কে? তিনি কেনই-বা 'গলবস্ত্র' হয়েছেন এবং কার কাছে? 'তীর্থ পর্যটনে'—কথাটির তাৎপর্য কি? 'আনন্দে শ্রীরাম তাঁরে লইলেন কোলে'—পঙ্‌ক্তিটির সারবত্তা নিরূপণ কর।

(খ) মিথ্যা অনুযোগ········দেখিবা প্রত্যক্ষ।

—বক্তব্যটি কে কার প্রতি করেছেন? 'বিমাতা' কে? পিতাই-বা কে? 'চতুর্দ্দশ বৎসর পালিয়া পিতৃবাক্য'—পঙ্‌ক্তিটির প্রসঙ্গ নির্ণয় কর। বক্তা 'কি' বলে অনুযোগকারীকে সান্ত্বনা দিলেন বুঝিয়ে বল।

মৌখিক প্রশ্ন ঃ—

১। (ক) 'চিত্রকূট' কোথায়? (খ) লক্ষ্মন কে এবং তাঁর মায়ের নাম কি? (গ) শত্রুঘ্ন কে এবং তাঁর মায়ের নাম কি? (ঘ) 'বামা জাতি'—কাদের বলে? (ঙ) 'বামা বুদ্ধি'—কথার অর্থ কি? (চ) 'অযোধ্যা' কি এবং কোথায়?

শব্দার্থ লেখ ঃ—

রঘুবর, বালা, পর্ণশালা, দীনবেশে, নীর, দেশান্তরে, ঘুচাও, সারি।

পদান্তর কর ঃ—

মলিন, শরীর, আগমন, অপরাধ, দেশ, বৎসর।

সমনামপদ লেখ ঃ—(প্রত্যেকটির কম পক্ষে তিনটি করে)

পর্ব্বত, নীর, শরীর, চরণ, কমল।



[১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ পরগণা জেলার কাঁচড়াপাড়ায় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাচীন ও আধুনিক কাব্যধারার যুগসন্ধিক্ষণের কবি। নীতিমূলক ও ব্যঙ্গমূলক কবিতা রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কবি ইহলোক ত্যাগ করেন।]

মহৎ যে হয় তার সাধু ব্যবহার।
উপকার বিনা নাহি জানে অপকার॥
দেখহ কুঠার করে চন্দন ছেদন।
চন্দন সুবাস তারে করে বিতরণ॥
কাক কারো করে নাই সম্পদ হরণ।
কোকিল করেনি কারে ধন বিতরণ॥
কাকের কঠোর রব বিষ লাগে কাণে।
কোকিল অখিল প্রিয় সুমধুর গানে॥
গুণময় হইলেই মানে সব ঠাঁই।
গুণহীনে সমাদর কোনখানে নাই॥
শারী আর শুকপাখী অনেকেই রাখে।
যত্ন কোরে কে কোথায়, কাক পুষে থাকে?
অধমে রতন পেলে কি হইবে ফল?
উপদেশে কখন কি সাধু হয় খল?

ভাল, মন্দ, দোষ, গুণ আধারেতে ধরে।
ভুজঙ্গ অমৃত খেয়ে গরল উগরে॥
লবণ জলধি জল করিয়া ভক্ষণ।
জলধর করিতেছে সুধা বরিষণ॥
সুজনে সুযশ গায় কুযশ ঢাকিয়া,
কুজনে কুরব করে সুরব নাশিয়া॥

॥ অনুশীলনী ॥

সাধারণ প্রশ্ন ঃ—

১। গুণময় ও গুণহীন সম্পর্কে সকলের কিরূপ মনোভাব লক্ষ্য করা যায় 'কবির কবিতা অনুসরণে তাহা বল।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ—

১। মহতের স্বভাব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কবি কোন্ কোন্ উপমার উল্লেখ করেছেন তা নির্দেশ কর।

২। সুজন ও কুজনের স্বভাবের পার্থক্য নিরূপণ কর।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ—

১। (ক) দেখহ কুঠার করে……করে বিতরণ।

—কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তি? উক্তিটি কার? কবিতাটির নাম বল। 'কুঠার'—শব্দের অর্থ কি? কুঠারের 'কাজ' কি? 'চন্দন' কি? 'চন্দন সুবাস তারে করে বিতরণ'—পংক্তিটির সরলার্থ লেখ। 'কুঠার' ও 'চন্দন' কে কোন্ শ্রেণীর?

(খ) কাক কারো……সুমধুর গানে।

—কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তি? 'কাক' ও 'কোকিল'-এর চেহারা কেমন? কাক ও কোকিলের উপমা স্মরণে কোন যুক্তিভিত্তিক তথ্য থাকলে বুঝিয়ে বল। স্বরবিচারে কে কোন্ শ্রেণীর? কবিতা প্রসঙ্গে উপমাটি বিশ্লেষণ কর।

(গ) অধমে রতন পেলে……… গরল উগরে।

—কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তি? 'অধম' ও 'সাধু'-র প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। 'ভুজঙ্গ' শব্দটির অর্থ কি? 'ভুজঙ্গ অমৃত' খেয়ে 'গরল উগরে'—পংক্তিটির অর্থ নিরূপণ কর।

(ঘ) লবণ জলধি জল…… সুরব নাশিয়া।

—'জলধি' ও 'জলধর' শব্দের অর্থ কি? 'সুজন' ও 'কুজন'—এদের স্বভাবের পার্থক্য বুঝিয়ে বল।

শব্দার্থ লেখ ঃ—

সুবাস, বিতরণ, হরণ, রব, ঠাঁই, সমাদর, খল, গরল, সুধা।



[ষোড়শ শতাব্দীর কবি কাশীরাম দাস। পৈতৃক নিবাস বর্ধমান জেলার সিঙ্গি গ্রাম। পিতার নাম কমলাকান্ত। তিনি বাংলা মহাভারত রচয়িতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কথিত আছে যে, কাশীরাম আদি, সভা, বন ও বিরাট পর্ব পর্যন্ত রচনা করেছিলেন।]

ক্রোধ সম পাপ আর না আছে সংসারে।
প্রত্যক্ষ শুনহ ক্রোধ যত পাপ ধরে॥
লঘু-গুরু জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধ কালে।
অবক্তব্য কথা লোকে ক্রোধ হলে বলে॥
থাকুক অন্যের কথা আজু হয় বৈরী।
বিষ খায়, ডুবে মরে, অস্ত্র অঙ্গে মারি'॥
এ কারণে বুধগণ সদা ক্রোধ ত্যজে।
অক্রোধ যে লোক, তাকে সর্বলোক পূজে॥
ক্রোধে পাপ, ক্রোধে তাপ, ক্রোধে কুলক্ষয়।
ক্রোধে সর্বনাশ হয়, ক্রোধে অপচয়॥
হেন ক্রোধ যেইজন জিনিবারে পারে।
ইহলোক, পরলোক, অবহেলে তরে॥

॥ অনুশীলনী ॥

সাধারণ প্রশ্ন ঃ—

১। ক্রোধ কেন পরিত্যাগ করা উচিত ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ—

১। (ক) 'বুধগণ সদা ক্রোধ' ত্যাগ করেন কেন ? (খ) ক্রোধের 'ফল কি ? (গ) ক্রোধ দমন করতে পারলে কি লাভ হয় ?

গদ্যরূপ লেখ ঃ—

সম, শুনহ, সদা, ত্যজে, হেন, জিনিবারে, তরে।

শব্দার্থ লেখ ঃ—

প্রত্যক্ষ, আজু, বৈরী, বুধগণ, অপচয়।

নিম্নরেখ পদগুলোর কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ—

১। (ক) ক্রোধ সম পাপ আর না আছে সংসারে। (খ) অবক্তব্য কথা লোকে ক্রোধ হলে বলে। (গ) এ কারণে বুধগণ সদা ক্রোধ ত্যজে। (ঘ) ক্রোধে অপচয়।

বিপরীতার্থক শব্দ লেখ ঃ—

পাপ, প্রত্যক্ষ, লঘু, গুরু, অবক্তব্য, বৈরী।





[হুগলী জেলার গুলিটা গ্রামে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই এপ্রিল হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। বি. এ. বি. এল পাস করে প্রথমে মুন্সেফ এবং পরে হাইকোর্টের উকিল হন। তাঁর রচিত প্রধান কাব্যগ্রন্থ 'বৃত্রসংহার' মহাকাব্য 'বীরবাহু', 'দশমহাবিদ্যা', 'চিন্তাতরাঙ্গিনী', ও 'অশোককানন' প্রভৃতি। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে মে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।]

ব'লো না কাতর স্বরে বৃথা জন্ম এ সংসারে
এ জীবন নিশার স্বপন,
দারা পুত্র পরিবার, তুমি কার, কে তোমার—
ব'লে জীব ক'রো না ক্রন্দন।
মানব-জনম সার এমন পাবে না আর,
বাহ্যদৃশ্যে ভুলো না রে মন ;
কর যত্ন হবে জয়, জীবাত্মা অনিত্য নয়,
ওহে জীব কর আকিঞ্চন।
ক'রো না সুখের আশ প'রো না দুখের ফাঁস,
জীবনের উদ্দেশ্য তা নয় ;
সংসারে সংসারী সাজ, করো নিত্য নিজ কাজ,
ভবের উন্নতি যাতে হয়।

দিন যায়, ক্ষণ যায়, সময় কাহারো নয়,
বেগে ধায় নাহি রহে স্থির,—
সহায় সম্পদ বল সকলি ঘুচায় কাল,
আয়ু যেন শৈবালের নীর !
সংসার-সমরাঙ্গণে যুদ্ধ কর দৃঢ়পণে,
ভয়ে ভীত হয়ো না মানব !
কর যুদ্ধ বীর্যবান, যায় যাবে যাক প্রাণ,
মহিমাই জগতে দুর্লভ।
মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে ক'রে গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য ক'রে স্বীয় কীর্তি-ধ্বজা ধ'রে
আমরাও হব বরণীয়।
সময়-সাগর তীরে, পদাঙ্ক অঙ্কিত করে
আমরাও হব হে অমর ;
সেই চিহ্ন লক্ষ্য ক'রে, অন্য কোন জন পরে,
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর।

॥ অনুশীলনী ॥

সাধারণ প্রশ্ন ঃ—

১। কবি যে আদর্শ জীবনের কথা বলেছেন তা নিজের ভাষায় বিবৃত কর।
২। কবিতা অনুসরণে কবির উপদেশাবলী নিজের কথায় প্রকাশ কর।
৩। কবিতাটির মর্মার্থ লেখ।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ—

১। (ক) করো না সুখের আশ····· ভবের উন্নতি যাতে হয়।
—কবিতাংশটি কার কোন কবিতা থেকে উদ্ধৃত? প্রসঙ্গ নির্ণয় কর।

জীবনের উদ্দেশ্য' সম্পর্কে তোমার কি ধারণা বল ? 'ভবের উন্নতি' কিসে হবে বলে কবি জানিয়েছেন ?

(খ) মহাজ্ঞানী মহাজন···আমরাও হব বরণীয় ।

—কবিতাংশটির প্রসঙ্গ নির্ণয় কর। 'প্রাতঃস্মরণীয়'—কথাটির অর্থ কি ? 'আমরা'—বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে ? কিভাবে 'বরণীয়' হওয়া যাবে সে সম্পর্কে কবির মনোভাব কি ?

শব্দার্থ লেখ ঃ—

দারা, বাহু, অনিত্য, আকিঞ্চন, ঋন, ধার, দুর্লভ, কীর্তিধ্বজা, সাধন, জীবন।

পদান্তর কর ঃ—

কাতর, জয়, কাজ, উন্নতি, সম্পদ, দৃঢ়, সাধন, জীবন।

সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ—

জীবাত্মা, উন্নতি, সমরাঙ্গনে, মনোহর, সঙ্কল্প, পদাঙ্ক, যশোদ্বারে।

নিম্নরেখ পদগুলোর কোন্‌টি কি পদ নির্ণয় কর ঃ

১। (ক) দিন যায়, ক্ষণ যায়। (খ) 'যুদ্ধ 'কর দৃঢ় পণে'। (গ) 'কর যুদ্ধ বীর্য্যবান'। (ঘ) আমরা 'পুন আর 'ডেকে এনে'। (ঙ) 'আমরাও হব হে অমর'।





[১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে জানুয়ারী যশোহর জেলায় সাগরদাঁড়ি গ্রামে মধুসূদন দত্তের জন্ম হয়। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করার পর মধুসূদনের নাম হয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ইংরেজী সাহিত্যে খ্যাতি অর্জন করার উদ্দেশ্যে কবি বিদেশে যান। পরে দেশে ফিরে আসেন। কবির বাল্যবন্ধু গৌরদাস বসাক এবং বেথুন সাহেবের প্রেরণায় তিনি এখানে বাংলা ভাষা চর্চায় মনোনিবেশ করেন। রচনা করেন মেঘনাদবধ, ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে জুন তিনি পরলোকগমন করেন।]

রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণ-লতিকারে—
"শুন মোর কথা, ধনি ! নিন্দ বিধাতারে।
নিদারুণ তিনি অতি নাহি দয়া তব প্রতি
তেঁই ক্ষুদ্র কায়া করি' সৃজিলা তোমারে।
মলয় বহিলে, হায় ! নতশিরা তুমি তায়,
মধুকর ভরে তুমি পড়লো হেলিয়া ;
হিমাদ্রি সদৃশ আমি, বনবৃক্ষ-কুল-স্বামী,
মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া।

কালাগ্নির মতো তপ্ত তপন-তাপন
আমি কি লো ডরাই কখন ?
দূরে রাখি' গাভী-দলে রাখাল আমার তলে
বিরাম লভয়ে অনুক্ষণ ;
শীতলিয়া মোর ডরে সদা আসি' সেবা করে
মোর অতিথিরে হেথা আপনি পবন।
শুন, ধনি ! রাজ-কাজ দরিদ্র-পালন,
—আমার প্রসাদ ভুঞ্জে পথগামী জন।
কেহ অন্ন রাঁধি খায়, কেহ পড়ি' নিদ্রা যায়
এ রাজ-চরণে
মধু-মাখা ফল মোর বিখ্যাত ভুবনে,
—তুমি কি তা' জান না, ললনে !
দেখ মোর জলরাশি কত পাখী বাঁধে আসি
বাসা এ আগারে ;
ধন্য মোর জনম সংসারে।
কিন্তু তব দুঃখ দেখি' নিত্য আমি দুখী ;
নিন্দ বিধাতায় তুমি, নিন্দ বিধুমুখি !"
নীরবিলা তরু-রাজ ; উড়িল গগনে
যমদূতাকৃতি মেঘ গম্ভীর স্বননে।
আইলেন প্রভঞ্জন, সিংহনাদ করি ঘন,
যথা ভীম ভীমসেন কৌরব-সমরে।
মহাঘাতে মড়মড়ি' রসাল ভূতলে পড়ি'
হায় ! বায়ু-বলে
হারাইলা আয়ু-সহ দর্প বনস্থলে।
উচ্চশির যদি তুমি কুল-মান-ধনে
করিও না ঘৃণা তবু নীচশির জনে॥

॥ অনুশীলনী ॥

সাধারণ প্রশ্ন :—

১। রসাল স্বর্ণলতিকাকে যে-সব কথা বলেছিল তার বর্ণনা দাও।

২। স্বর্ণলতিকাকে আক্রমণ করে রসাল যে অহঙ্কার প্রকাশ করেছিল তা পরিস্ফুট কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ—

১। 'নাহি দয়া তব প্রতি'—এখানে কার 'দয়ার' কথা বলা হয়েছে ? 'তব প্রতি'—বলতে কার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং এই ইঙ্গিতটি কার ? বক্তা তার প্রমাণস্বরূপ কি ব্যাখ্যা দিয়েছে ?

২। 'ধন্য মোর জনম সংসারে !'—বক্তা কে ? তার জনম ধন্য কেন—সে সম্পর্কে সে কি কি যুক্তি উপস্থাপিত করেছে ?

৩। 'হারাইলা আয়ু-সহ দর্প বনস্থলে'—এই ভাবণটি কার ? কে কিভাবে আয়ু হারাল ? 'আয়ু সহ'—কথাটির তাৎপর্য কি ?

৪। "অহঙ্কারীর পতন অনিবার্য"—এই উক্তির যথার্থতা রসাল ও স্বর্ণলতিকা নামক কবিতা অবলম্বনে প্রমাণ করতে পার কি ?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :—

১। নীরবিলা তরু-রাজ······কৌরব-সমরে।

—উক্ত ছত্রকটি কোন কবিতার অংশ বিশেষ ? কবির নাম কি ? 'তরু-রাজ' কাকে বলা হয়েছে ? 'যমদূতাকৃতি'—কথাটির তাৎপর্য কি ? 'প্রভঞ্জন' কে ? 'ভীম সেন' কোন্ পাণ্ডব ? 'কৌরব-সমর' কোথায় হয়েছিল ? কবির এই উপমাটি কতদূর সার্থক হয়েছে প্রমাণ কর।

(খ) উচ্চশির যদি তুমি······নীচশির জনে।

—উপদেশটি কার ? 'উচ্চশির' ও 'নীচশির'—শব্দগুলো কাদের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়েছে ? উপদেশটির প্রসঙ্গ নির্ণয় কর। বর্তমান দিনে এই জাতীয় উপদেশের প্রয়োজনীয়তা আছে কি ?

মৌখিক প্রশ্ন :—

১। (ক) 'মধুকর', 'হিমাদ্রি'—কাদের বলা হয় ? প্রত্যেকটির দুটি করে

সমনাম শব্দ লেখ। (খ) রাজার কাজ কি? (গ) রসাল কিভাবে রাজ-কাজ পালন করে?

গদ্যরূপ লেখ ঃ—

নিন্দ, তেঁই, স্বজিলা, নভঃয়, মোর, হেথা, আইলেন, নীরবিলা।

শব্দার্থ লেখ ঃ—

ধনি, কায়া, মলয়, সদৃশ, শির, তপন, ডরাই, অনুক্ষণ, পবন, ভুঞ্জে, মধু মাখা, আগারে, বিধুমুখি, স্বননে, ভূতলে।

নিম্নরেখ পদগুলোর কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ—

১। (ক) নিন্দ বিধাতারে। (খ) স্বজিলা তোমারে। (গ) মেঘলোকে উঠে শির। (ঘ) কেহ অন্ন রাঁখি যায়। (ঙ) বায়ু-বলে। (চ) কুল-মান-ধনে।

লিঙ্গান্তর কর ঃ—

বিধাতা, নতশিরা, মধুকর, স্বামী, দরিদ্র।





[বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ জোড়াসাঁকোয় বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মাঝে তাঁর শিক্ষা বেশীদূর অগ্রসর হয়নি। তথাপি তিনি বিশ্ববিখ্যাত কবিখ্যাতির অধিকারী হন এবং প্রথম ভারতীয় হিসাবে বাংলা সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি বিভাগ তাঁর রচনায় সমৃদ্ধ। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় কবি এই সঙ্গীতটি রচনা করেন। ১৯৪১ সালে ৭ই আগষ্ট কবি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হন।]

আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়াছে দেশ ছেয়ে।
হের ঐ ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে!
বাজিতেছে উৎসবের বাঁশী
কানে তাই পশিতেছে আসি,
ম্লান চোখে তাই ভাসিতেছে দুরাশার সুখের স্বপন;
চারিদিকে প্রভাতের আলো
নয়নে লেগেছে বড় ভালো,
আকাশেতে মেঘের মাঝারে শরতের কনক তপন।

কত কে যে আসে কত যায়,
কেহ হাসে কেহ গান গায়,
কত বরণের বেশ-ভূষা ঝলকিছে কাঞ্চন-রতন ;
কত পরিজন দাসদাসী.
পুষ্প পাতা কত রাশি রাশি,
চোখের উপরে পড়িতেছে মরীচিকা ছবির মতন ;
হেরে তাই রহিয়াছে চেয়ে
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে !
শুনেছে সে, মা এসেছে ঘরে তাই বিশ্ব আনন্দে ভেসেছে,
মা'র মায়া পায়নি কখনো, মা কেমন দেখিতে এসেছে ।
তাই বুঝি আঁখি ছলছল, বাষ্পে ঢাকা নয়নের তারা !
চেয়ে যেন মার মুখপানে বালিকা কাতর অভিমানে
বলে—"মাগো এ কেমন ধারা !
এত বাঁশি, এত হাসিরাশি, এত তোর রতন ভূষণ,
তুই যদি আমার জননী, মোর কেন মলিন বসন ?"
ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি ভাই বোন ক'রে গলাগলি,
অঙ্গনেতে নাচিতেছে ওই ;
বালিকা দুয়ারে হাত দিয়ে, তাদের হেরিছে দাঁড়াইয়ে,
ভাবিতেছে নিশ্বাস ফেলিয়ে আমি তো ওদের কেহ নই !
স্নেহ করে আমার জননী পরায়ে তো দেয়নি বসন,
প্রভাতে কোলেতে করে' নিয়ে মুছায়ে তো দেয়নি নয়ন !
আপনার ভাই নেই বলে' ওরে কিরে ডাকিবে না কেহ ?
আর কারো জননী আসিয়া ওকে কিরে করিবে না স্নেহ ?
ওকি শুধু দুয়ার ধরিয়া উৎসবের পানে রবে চেয়ে.
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে ?
অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি জননীরা আয় তোরা সব,
মাতৃহারা মা যদি না পায় তবে আজ কিসের উৎসব ?
দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া ম্লানমুখ বিষাদে বিরস,
তবে মিছে সহকার-শাখা—তবে মিছে মঙ্গল-কলস !

॥ অনুশীলনী ॥

সাধারণ প্রশ্ন :—

১। কাঙালিনী মেয়েটি কে? আনন্দময়ীর আগমনেও তার মুখে হাসি নেই কেন?

২। পূজার দিনের সহকার শাখা ও মঙ্গল-কলস মিথ্যা কেন? কি করলে মায়ের 'পূজা' সার্থক হবে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :—

১। (ক) আনন্দময়ী কে? আনন্দময়ীর আগমন সাধারণতঃ কোন্ মাসে ঘটে?

(খ) কাঙালিনী মেয়ে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে এবং কেন?

(গ) "মাগো এ কেমন ধারা!"—অনুযোগটি কার? এই 'মা' কে? 'ধারা' শব্দটির অর্থ কি? বক্তা 'ধারা' শব্দটি প্রয়োগ করে কি বলতে চেয়েছে?

(ঘ) 'ভাবিতেছে, নিশ্বাস ফেলিয়ে আমি তো ওদের কেহ নই!'—কথাটি কার? 'ওদের' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? বক্তার এরূপ দুঃখের কারণ কি?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

১। (ক) তুই যদি আমার ····· বসন?

—পংক্তিটি কোন্ কবিতা থেকে উদ্ধৃত? কবি কে? অনুযোগটি কার? 'তুই'—কাকে বলা হয়েছে? উক্ত অংশটির প্রসঙ্গ নির্ণয় কর। জাতির এরূপ দুর্গতি মোচনে তুমি সাহায্য করবে কি এবং কিভাবে?

(খ) মাতৃহারা মা যদি ···· উৎসব?

—প্রশ্নটি কার? কোন্ প্রসঙ্গে? 'মাতৃহারা'টি কে? 'উৎসব' বলতে কি বোঝ? বক্তার এই জাতীয় প্রশ্ন অবতারণার কারণ কি?

গদ্যরূপ লেখ :—

হের, স্বপন, রতন, চেয়ে, পানে, রবে।

শব্দার্থ লেখ :—

ছেয়ে, ম্লান, নয়নে, কনক, কাঞ্চন, পরিজন, মরীচিকা, ভূষণ, অঙ্গনেতে অনাথ, বিষাদে বিরস, সহকার-শাখা।

পদান্তর কর :—

দেশ, পুষ্প, মায়া কাতর, ভূষণ, নিশ্বাস, স্নেহ।

লিঙ্গান্তর কর :—

কাঙালিনী, মেয়ে, মা, বালিকা, জননী, অনাথ, মাতৃহারা।



[কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই ফেব্রুয়ারী বর্ধমান জেলায় চুপী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবি বি. এ পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। তিনি ছিলেন বাংলার প্রিয় কবি। নূতন নূতন ছন্দে কবিতা রচনা করে বাংলা সাহিত্যজগতে অমর হয়ে আছেন। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ছন্দের যাদুকর। তাঁর রচিত কাব্য—বেণু ও বীণা, হোম শিখা, ফুলের ফসল, কুহু ও কেকা। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে জুন কবি চিরদিনের মত আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।]

কে বলে তোমারে বন্ধু, অস্পৃশ্য অশুচি ?
শুচিতা ফিরিছে সদা তোমার পিছনে ;
তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি,
নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে।
শিশুজ্ঞানে সেবা তুমি করিতেছ সবে,
ঘুচাইছ রাত্রি-দিন সর্ব্ব ক্লেদ-গ্লানি !
ঘৃণার নাহিক কিছু স্নেহের মানবে ;—
হে বন্ধু ! তুমিই একা জেনেছ সে বাণী।
নির্ব্বিচারে আবর্জ্জনা বহ অহর্নিশ,
নির্ব্বিকারে সদা শুচি তুমি গঙ্গাজল।
নীলকণ্ঠ করেছেন পৃথ্বীরে নির্ব্বিষ ;
আর তুমি ! তুমি তারে করেছ নির্ম্মল।
এস বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে,
কল্যাণের কর্ম্ম করি' লাঞ্ছনা সহিতে।

॥ অনুশীলনী ॥

সাধারণ প্রশ্ন ঃ—

১। কবিতাটির ভাবার্থ লেখ।

২। কবি 'সতেন্দ্রনাথ দত্ত' যে 'প্রশস্তি' গেয়েছেন তা নিজের ভাষায় গুছিয়ে' লেখ এবং তা অতিরঞ্জিত কিনা সে সম্পর্কে তোমার অভিমত প্রকাশ কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ—

১। 'কে বলে তোমারে বন্ধু, অস্পৃশ্য অশুচি ?'
—কে, কাকে, 'বন্ধু' বলে সম্বোধন করেছেন ? 'অস্পৃশ্য অশুচি' বিশেষণে বিশেষিত করার কোন তাৎপর্য আছে কি ?

২। 'হে বন্ধু! তুমিই একা জেনেছ সে বাণী'।—এখানে 'বন্ধু' কে ? 'একা' শব্দটি প্রয়োগের তাৎপর্য কি ? 'বাণী'টি কি ?

৩। 'আর তুমি! তুমি তারে করেছ নির্মল'।—'তুমি' কে ? 'তারে' কথাটি কোন্ অর্থে প্রযুক্ত ? কিভাবে 'নির্মল' করা হয়েছে কবির ভাবনা অনুযায়ী বিবৃত কর।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :—

১। (ক) কে বলে তোমারে······যেত বনে।
—উদ্ধৃতিটি কোন্ কবিতার অন্তর্গত ? রচয়িতা কে ? 'শুচিতা' কার পেছনে ঘুরছে এবং তা কিভাবে ? 'তুমি' বলে কার কথা উল্লেখ করা হয়েছে ? গৃহবাসে তার প্রয়োজনীয়তা কি ? তার অভাবে মানুষের কি অসুবিধা ঘটত ?

(খ) নীলকণ্ঠ······ লাঞ্ছনা সহিতে।
—'নীলকণ্ঠ' কে ? তিনি কিভাবে পৃথিবীকে নির্বিষ করেছিলেন—সেই পৌরাণিক কাহিনীটি বল। কে, কিভাবে তা 'নির্মল' করেছেন ? তাকে 'বন্ধু' এবং 'বীর' আখ্যা দেওয়া যায় কি ? 'চিতে' শব্দটির অর্থ কি ? 'কল্যাণের কর্ম্ম করি' বলতে কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন ?

সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ—

নির্ব্বিচারে, অহর্নিশ, নির্ব্বিকারে, নির্ব্বিষ, নির্ম্মল।

পদান্তর কর ঃ—

অস্পৃশ্য, শুচিতা, নির্ম্মল, বীর, কর্ম্ম, লাঞ্ছনা।



[মহিলা কবি কামিনী রায় ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই অক্টোবর বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল জেলার বাসণ্ডায় জন্মলাভ করেন। সংস্কৃতে অনার্স-সহ বি, এ. পাশ করে কবি বেথুন স্কুলের শিক্ষিকা হন। আলো ও ছায়া, মালা নির্মাল্য, দীপ ও ধূপ কাব্য-গ্রন্থসমূহ তিনি রচনা করেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে সেপ্টেম্বর তিনি আমাদের ছেড়ে অমরধামে গমন করেছেন।]

নাই কি রে সুখ ? নাই কি রে সুখ ?
এ ধরা কি শুধু বিষাদময় ?
যাতনে জ্বলিয়া, কাঁদিয়া মরিতে
কেবলি কি নর জনম লয় ?
কাঁদাতেই শুধু বিশ্ব-রচয়িতা
সৃজেন কি নরে এমনই ক'রে ?
মায়ার ছলনে উঠিতে পড়িতে
মানব-জীবন অবনী 'পরে ?

বল্ ছিন্ন বীণে বল্ উচ্চৈঃস্বরে,—
না,—না,—না,—মানবের তরে
আছে উচ্চ লক্ষ্য, সুখ উচ্চতর,
না সৃজিলা বিধি কাঁদাতে নরে ?
কার্য্যক্ষেত্র ঐ প্রশস্ত পড়িয়া,
সমর-অঙ্গন সংসার এই ;
যাও বীরবেশে কর গিয়া রণ ;
যে জিনিবে সুখ লভিবে সে-ই ।
পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও ;
তার মত সুখ কোথাও কি আছে ?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও ।
পরের কারণে মরণেও সুখ,
'সুখ' 'সুখ' করি কেঁদো না আর ;
যতই কাঁদিবে ততই ভাবিবে,
ততই বাড়িবে হৃদয়-ভার ।
'বিষাদ' 'বিষাদ' 'বিষাদ' বলিয়ে
কেনই কাঁদিবে জীবন ভ'রে ?
মানবের মন এত কি অসার ?
এতই সহজে নুইয়ে পড়ে ?
সকলের মুখে হাসি-ভরা দেখে
পার না মুছিতে নয়ন-ধার ?
পরহিতব্রতে পার না রাখিতে
চাপিয়া আপন বিষাদ-ভার ?
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী 'পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে ।

॥ অনুশীলনী ॥

সাধারণ প্রশ্ন ঃ—

১। দুঃখ-কষ্টময় সংসারে প্রকৃত সুখ কিরূপে লাভ করা যায় তা সংক্ষেপে বুঝিয়ে বল।

ব্যাখ্যা কর ঃ—

১। (ক) পরের কারণে·····ভুলিয়া যাও।

(খ) আপনারে ·····পরের তরে।

শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ—

সকলের মুখে—— —— দেখে ; পার না———নয়ন-ধার ? —— পার না রাখিতে চাপিয়া —— বিষাদ-ভার ?

মৌখিক প্রশ্ন ঃ—

১। (ক) কামিনী রায়ের আর কোন কবিতার নাম করতে পার কি ?

(খ) অন্য কোন মহিলা কবির নাম উল্লেখ করতে পার কি ?

(গ) 'সুখ'-এর বিপরীত শব্দ 'দুঃখ' নয় কি ? 'দুঃখ' নাম দিয়ে আর কোন কবির রচনা তোমার জানা আছে কি ?

শব্দার্থ লেখ ঃ—

বিষাদময়, সমর-অঙ্গন, কারণে, স্বার্থে, পরহিতব্রতে, বিব্রত।

সমনাম শব্দ লেখ ঃ— (প্রত্যেকটির কমপক্ষে দু'টি)

অবনী, রণ, হৃদয়, নয়ন, বিষাদ।



[বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে মে বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মলাভ করেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি সেনা-বিভাগে যোগদান করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অবসর সময়ে কাব্য ও সাহিত্য রচনায় তিনি মনোনিবেশ করিতেন। তিনি ছিলেন একজন গীতিকার ও সুরকার। কাব্যগ্রন্থ—অগ্নিবীণা, দোলনচাঁপা, ছায়ানট, বিষের বাঁশী ; উপন্যাস—বাঁধনহারা, মৃত্যুক্ষুধা ; ছোটগল্প—ব্যথার দান, রিক্তের বেদন প্রভৃতি তাঁর প্রতিভা ও মনীষার সাক্ষ্য বহন করছে। ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে আগস্ট তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে।]

ভোরের বেলা পূব গগনে সূর্যি-ঠাকুর দেন উঁকি,
বলেন, অলস জড়ের মতন ব'সে ব'সে ভাব্‌ছ কি ?
আমার আকাশ-মায়ের কোলে জাগি আমি ভোরবেলায়,
আমার হাসির উচ্ছলতা বনে বনে ফুল ফোটায়।
ক্রমেই যত উর্ধ্বে উঠি, ততই আমি হই প্রখর,
শক্তি তেজের উজল দ্যুতি ছড়াই বিশ্ব ভুবন 'পর।
রঙে রঙে রাঙাই আকাশ যখন সাঁঝে অস্ত যাই,
ত্রিলোক মলিন, মোর বিদায়ে যাবার বেলা দেখতে পাই।
তোমার জীবন এমনি হবে শৈশবে আনন্দময়,
যেথায় যাবে সেথায় যেন নূতন প্রাণের লহর বয়।

তোমার শক্তি—তপস্যাতে আসবে কাছে উর্ধ্বলোক,
তোমার আলো দূর করিবে ত্রিজগতের দুঃখশোক।
এই পৃথিবীর আঁধার যত, এই মানুষের সকল ভয়
করবে মোচন শক্তি দিয়ে, শৌর্য দিয়ে, হে দুর্জয়!
দেশের জাতির লজ্জা গ্লানি, কলঙ্ক ও অপমান,
তোমার তেজে দগ্ধ হবে, জাগবে বুকে নূতন প্রাণ।
যে সব আত্ম-অবিশ্বাসী ভয়ের গুহায় লুকিয়ে রয়,
তোমার ডাকে আসবে ছুটি, হে তেজোবীর, হে দুর্জয়!
যে আদর্শ মানুষ আজও জন্মেনিক এই ধরায়
তুমিই হবে সেই সে মানুষ অধ্যবসায় তপস্যায়।
সূর্য সম শেষ জীবনে রাঙিয়ে যাবে দিগ্বিদিক।
যুক্ত-করে বিশ্বনিখিল গাইবে তোমার মাঙ্গলিক।
অস্ত গেলে রবি যেমন জগৎ দেখ অন্ধকার
হারিয়ে তোমায় কাঁদবে শোকে তেমনি মানুষ এই ধরার।

॥ অনুশীলনী ॥

সাধারণ প্রশ্ন ঃ—

১। জীবনকে আমরা কেন সূর্যের মতন গড়ে তুলব তার কারণ নির্ণয় কর।

২। 'অলস জড়ের মতন ব'সে ব'সে ভাবছ কি ?'—বক্তব্যটি কার ? তিনি কাকে এই জাতীয় প্রশ্ন করেন ? উদ্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি তাঁর পরামর্শ কি ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ—

১। 'তোমার ডাকে আসবে ছুটি, হে তেজোবীর, হে দুর্জয়!'
—'তেজোবীর', 'দুর্জয়'—কার বিশেষণ ? কার ডাকে কে ছুটে আসবে ? তারা আছেই বা কোথায় ?

২। 'যুক্ত-করে বিশ্বনিখিল গাইবে তোমার মাঙ্গলিক।'
—ক'ার মাঙ্গলিক গাইবে এবং কেন ?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ—

১। 'অস্ত গেলে রবি——মানুষ এই ধরার।'

কবিতাংশটি কোন্ কবিতার? কবিতার রচয়িতা কে? প্রসঙ্গ নির্ণয় কর। 'হারিয়ে'—কথার তাৎপর্য কি? 'তোমায়' বলতে কার কথা উল্লেখ করা হয়েছে? এই ধরার মানুষ কাঁদবে কেন?

শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ

যে সব — ভয়ের গুহায় — রয়,
তোমার — আসবে ছুটি, হে — হে দুর্জয়!
যে — মানুষ আজও জন্মেনিক এই —
তুমিই হবে — সে মানুষ — তপস্যায়।

নিম্নরেখ পদগুলোর কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ—

১। (ক) বনে বনে ফুল ফোটায়। (খ) তোমার শক্তি-তপস্যাতে আসবে কাছে উর্ধ্বলোক। (গ) তোমার আলো দূর করিবে ত্রিজগতের দুঃখ-শোক। (ঘ) তোমার তেজে দগ্ধ হবে। (ঙ) জাগবে বুকে নূতন প্রাণ।

পদান্তর করে বাক্য রচনা কর ঃ—

অলস, প্রখর, ভয়, মোচন, লজ্জা, কলঙ্ক, অপমান।

সমনাম শব্দ লেখ ঃ— (প্রত্যেকটির কমপক্ষে তিনটি

গগন, ফুল, আকাশ, ধরা।

ডান দিকের বন্ধনীর মাঝে সঠিক বাক্যাংশটি নিয়ে শূন্যস্থানে বসাও ঃ—

১। (ক) ভোরের বেলা — গগনে সূর্যি ঠাকুর দেন উকি। (পুব/পশ্চিম/উত্তর/দক্ষিণ)

(খ) আমার হাসির উচ্ছলতা — ফুল ফোটায়। (গাছে গাছে/বনে বনে/পাতায় পাতায়)

(গ) রঙে রঙে রাঙাই — যখন সাঁঝে অস্ত যাই। (পৃথিবী/আকাশ/জীবন)

(ঘ) তোমার শক্তি-তপস্যাতে আসবে কাছে —। (ভূলোক/দ্যুলোক/উর্ধ্বলোক)



বিষয়বস্তু ঃ—[আজকের যারা কিশোর তারাই আগামী দিনের নাগরিক। আজকের যারা কুঁড়ি তারাই ভাবীকালের পরিপূর্ণ ফুল। এদের মাঝে আছে দেশ আবিষ্কারক, বৈজ্ঞানিক এবং দেশনায়ক। বিচিত্র কর্মধারার স্রোতে ওরা বিদেশে পাড়ি জমাবে এবং নিজের দেশকে ধন্য করে তুলবে।]

আমরা নূতন আমরা কুঁড়ি নিখিল বন-নন্দনে,
ওষ্ঠে রাঙা হাসির রেখা জীবন জাগে স্পন্দনে।
লক্ষ আশা অন্তরে ঘুমিয়ে আছে মন্তরে,
ঘুমিয়ে আছে বুকের ভাষা পাপড়ি-পাতার বন্ধনে॥
সকল কাঁটা ধন্য ক'রে ফুটব মোরাও ফুটব গো।
প্রভাত রবির সোনার আলো দু'হাত দিয়ে লুটব গো!
নিত্য নবীন গৌরবে ছড়িয়ে দিব সৌরভে,
আকাশ পানে তুল্‌ব মাথা সকল বাঁধন টুটব গো!
সাগর-জলে পাল উড়িয়ে কেউ বা হব নিরুদ্দেশ,
কলম্বসের মতন বা কেউ পৌঁছে যাব নূতন দেশ।
জাগ্‌বে সাড়া বিশ্বময়— এই বাঙালী নিঃস্ব নয়,
জ্ঞান-গরিমা শক্তি-সাহস আজও এদের হয়নি শেষ।

কেউ বা হ'ব সেনানায়ক গ'ড়ব নূতন সৈন্যদল
সত্য ন্যায়ের অস্ত্র ধরি', নাই বা থাকুক অন্য বল।
দেশ-মাতারে পূজব্ গো, ব্যথীর ব্যথা বুঝব্ গো,
ধন্য হবে দেশের মাটি ধন্য হবে অন্ন-জল।
জ্ঞানের মূল্য শিখব বলে কেউ বা যাব জার্মানি,
সবার আগেই চলব মোরা, সহজে কি হার মানি ?
শিল্পকলা শিখ্‌ব কেউ, গ্রন্থমালা শিখব কেউ,
কেউ বা হ'ব ব্যবসাজীবী, কেউ বা টাটা কার্ণানি।
ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে।
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে।
অবাধ আলোর আমরা পুত, নূতন আলোর অগ্রদূত,
কতই কি যে করব মোরা নাইক তাহার অন্ত রে!

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন :—

১। কিশোরের বিচিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিচয় দাও।

২। কিশোরকে ফুলের কুঁড়ির সঙ্গে তুলনা করার সার্থকতা কোথায় ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :—

১। (ক) "কলম্বসের মতন বা কেউ পৌঁছে যাব নূতন দেশ।" —কলম্বস কে ? তিনি কোথাকার লোক ? তিনি কোন্ দেশ আবিষ্কার করেছিলেন এবং কি ভাবে ?

(খ) 'সত্য ন্যায়ের অস্ত্র' ধারণ করে কোন্ মহাপুরুষ স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন ?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :—

১। (ক) আমরা নূতন ……স্পন্দনে।

কোন্ কবির কোন্ কবিতার অন্তর্ভুক্ত এই অংশটি ? 'আমরা' কারা ? তাদের নূতন এ কুঁড়ি বলার তাৎপর্য কি ? কবিতাংশটির প্রসঙ্গ নির্ণয় কর। 'জীবন জাগে স্পন্দনে' কথাটির ব্যাখ্যা দাও।

(খ) সকল কাঁটা······লুটব গো।

'সকল কাঁটা' বলতে কি বোঝানো হয়েছে? 'মোরা'—কারা? 'ফুটব গো' —বাক্যাংশটির অন্তর্নিহিত সত্য উদ্ঘাটন কর। 'প্রভাত রবির সোনার আলো দু'হাত দিয়ে লুট্‌ব গো'—পংক্তিটি কবির ভাবনানুযায়ী বিবৃত কর।

(গ) ভবিষ্যতের লক্ষ আশ——অন্তরে।

'ভবিষ্যতের লক্ষ আশা'র ব্যাখ্যা দাও। 'সন্তরে'—শব্দটির অর্থ বল। 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে'—তা কি করেই-বা সম্ভব? 'কতই কি যে করব মোরা'—কবির এই বাক্যাংশটির ভাব অনুযায়ী তোমার নিজ জীবন ভাবনার পরিচয় দাও।

মৌখিক প্রশ্ন :—

১। (ক) পৃথিবীর দু'টি সাগরের নাম বল।

(খ) জার্মান কোন্ মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত?

(গ) 'টাটা' কি? এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা কে?

(ঘ) দুই বড় শিল্পী, গ্রন্থকার ও ব্যবসাজীবীর নাম উল্লেখ কর।

বাক্য রচনা কর :—

নূতন, নিখিল, জীবন, প্রভাত, নিত্য, মতন, কেউ, ব্যথা, অবধি।

পদান্তর কর :—

নূতন, জীবন, প্রভাত, নিরুদ্দেশ, জ্ঞান, সাহস, ব্যথা, শিল্প।





[পল্লী-কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ১লা মার্চ বর্ধমান জেলায় কোগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বি.এ. পাশ করে মাথরুন স্কুলের প্রধান শিক্ষকপদে বৃত হন। শিক্ষকতা-কার্যে নিযুক্ত থাকাকালে তিনি বহু কাব্যগ্রন্থ বাংলা সাহিত্যকে উপহার দেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ—শতদল, বনতুলসী, উজানী, বীথি, অজয়, স্বর্ণসন্ধ্যা প্রভৃতি। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই ডিসেম্বর কবি চিরনিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

কুমুদরঞ্জন ছিলেন পল্লীর কবি। পল্লীজীবনের মাধুর্য এবং পল্লীবাসীর প্রীতি এই কবিতাটিতে তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন।]

নাহি কাজ তার, নাই অবসর, বাড়ী বাড়ী ফেরে ঘুরি',
সারা গ্রামখানি খুঁজে দেখ তার মিলিবে না আর জুড়ি।
কতক গোয়ালে কতক বা মাঠে, ফেরে গোরু তার যত,
বেড়াহারা গাছ ছাগলে যে খায়, দেখিতে পারে না অত।
জন-মজুরেরা লাঙল চালায় আধা দিন দেয় ফাঁকি,
মাঠে যেতে বলো নোটনকে আর পাবেনাক' দেশে ডাকি'।
হাটে সাতবার যায় সে নিত্য পরের লাগি',
পরের বিপদে ঘুম নাহি চোখে কাটায় যামিনী জাগি'।

কোথায় ছেলেরা মেতেছে খেলায়, করিছে চড়ুই-ভাতি,
সকাল হতেই নোটন সেখানে হয়েছে তাদের সাথী।
গ্রামের ভিতর যাত্রা আসিলে যাবে না ফিরিয়া কভু,
ঘরে নাই ভাত, বাড়ী বাড়ী চাঁদা নোটন তুলিবে তবু।
জুয়াচোরে যদি কেঁদে ধার চায়, ধার ক'রে দেবে এনে,
ছাগল বেচিয়া শুধিয়াছে ধার, শেখে না ঠেকিয়া জেনে।
ভায়েরা এখন চিনেছে তাহাকে দেয় না পয়সা হাতে,
লক্ষ্মীছাড়ার কোন খেদ নাই, কোন দুখ নাই তাতে।
নাইক অভাব, তেমনি স্বভাব, না থাকুক কড়ি কাছে,
গিয়াছে কমলা, হৃদয়-কমল তেমনি ফুটিয়া আছে।

॥ অনুশীলনী ॥

সাধারণ প্রশ্ন ঃ—

১। গ্রামের বালক নোটনের পরোপকার প্রবৃত্তির বর্ণনা কর।

অথবা

কবি গ্রামের বালক নোটনের যে চরিত্র অঙ্কিত করেছেন, তা সহজ ভাষায় গুছিয়ে লেখ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ—

১। (ক) 'তার মিলিবে না আর জুড়ি'—কার 'জুড়ি' এবং কিসে মিলিবে না? (খ) 'ফেরে গোরু তার যত'—কার কথা বলা হয়েছে? তার গরু কোথায় থাকে? (গ) 'নূতনহাটে' সে যায় কেন? (ঘ) 'কাটায় যামিনী জাগি'—'যামিনী কথার অর্থ কি? কে 'যামিনী' জেগে কাটায় এবং কেন? (ঙ) 'গ্রামের ভিতর যাত্রা' এলে নোটন কি করে? (চ) 'শেখে না ঠেকিয়া জেনে'—কার শিক্ষা হয় না এবং কেন? 'ঠেকিয়া' শব্দটি কি অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে? (চ) 'কোন দুখ নাই তাতে'—কার দুঃখ নেই? 'তাতে' শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্ধার কর।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ—

১। নাইক অভাব———তেমনি ফুটিয়া আছে।

রচয়িতা কে? কবিতার নাম কি? কার কথা বলা হয়েছে? তার কিসের অভাব নেই? তার স্বভাবটি কেমন? 'কমলা' কে? 'হৃদয়-কমল'—কথাটির অর্থ পরিস্ফুট কর।

শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ—

গ্রামের ভিতর — আসিলে যাবে না ফিরিয়া —,
ঘরে নাই —, বাড়ী বাড়ী চাঁদা — তুলিবে তবু।
— যদি কেঁদে — চায়, — ক'রে দেবে এনে,
— বেচিয়া শুধিয়াছে—, শেখে না ঠেকিয়া জেনে।

নিম্নরেখ পদগুলোর কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ—

১। (ক) নাই কাজ তার। (খ) বাড়ী বাড়ী ফেরে ঘুরি। (গ) ফেরে গোরু তার যত। (ঘ) জনমজুরেরা লাঙল চালায়। (ঙ) পরের বিপদে ঘুম নাই। ঘরে নাই ভাত।

অব্যয় পদ নির্ণয় কর ঃ—

১। (ক) নাহি অবসর। (খ) ফেরে গোরু তার যত। (গ) যাবে না ফিরিয়া কভু। (ঘ) ভায়েরা এখন চিনেছে তাহাকে। (ঙ) তেমনি ফুটিয়া আছে।





[১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই জুলাই বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে কবি কালিদাস রায় ভূমিষ্ঠ হন। বি এ. পাস করে তিনি শিক্ষকতার কার্যে ব্রতী হন এবং কৃতী শিক্ষক রূপে সারাজীবন অতিবাহিত করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে 'জগত্তারিণী-স্বর্ণপদক' দিয়ে সম্মানিত করেন। তাঁর রচিত নানা কাব্যের মধ্যে 'গাথাঞ্জলি' 'পর্ণপুট', 'ঋতুমঙ্গল', 'কিশলয়', এবং 'হৈমন্তী' ইত্যাদি সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে অক্টোবর মৃত্যু বরণ করেন।]

টাকার কুমীর প্রেমদাস গুঁই কঞ্জুষ ছিল বড়,
ছাড়িত না সুদ একটি পয়সা যত পায়ে হাতে ধর।
তুলসীর মালা গলায় তাহার হরিনাম ঝোলা হাতে,—
সুদের হিসাব করিতে করিতে বেড়াত উঠানে ছাতে ;
একটি মুষ্টি ভিক্ষা চাহিলে, লাঠি নিয়ে যেত তেড়ে।
আধপেটা খেয়ে, টেনা পরে, টাকা মাটিতে রাখিত গেড়ে।
সহসা একদা— ভগবান কারে নিয়ে যান কোন দিকে
তার আজীবন-সঞ্চিত ধন খয়রাতে দিল লিখে।
ডাক্তারখানা, টোল, ইস্কুল, দেউল, অতিথিশালা
নির্ম্মাণ তরে সব দিল ; শুধু রেখে ঝোলা আর মালা
নামাবলি গায়ে কাঁথাখানি ঘাড়ে শ্রীরাধামাধব ব'লে
প্রেমদাস গুঁই গেলেন সহসা শ্রীবৃন্দাবন চলে।

যার নাম কেহ করিত না ভয়ে কভু, পাছে হাঁড়ি ফাটে।
শতবার তার নাম না করিয়া কারো দিন নাহি কাটে।
চন্দন তরু একটিও ফল দেয়নি ক্ষুধিতে ভুলে
একটিও ফুল ফুটায়ে কখনো তুষেনিক অলিকুলে।
দুর্গম মূলদেশে তার কেউ পায়নি শীতল ছায়া,
ব্যাঘ্রশাসিত কানন তাহার, সর্পে ভূষিত কায়া।
একদা তাহার সকল অঙ্গ নিবেদিল অকাতরে,
দারুভূত ঐ নিবিড় ভক্তি পলে পলে রস ক্ষরে।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন ঃ—

১। প্রেমদাস গুঁই-এর সঙ্গে চন্দন তরুর উপমাটি কতদূর সার্থক হয়েছে আলোচনা কর।

২। কৃপণ প্রেমদাস অকস্মাৎ বিখ্যাত হয়ে উঠল কি করে বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ—

১। (ক) প্রেমদাসের বেশ-বাস কি ছিল? (খ) 'উঠানে' কিংবা 'ছাতে' বেড়ানোর সময় সে কি করত? (গ) লোকে ভিক্ষা চাইলে সে তার সঙ্গে কি ব্যবহার করত? (ঘ) তার আজীবন-সঞ্চিত ধন সে কিভাবে ব্যয় করল? (ঙ) তার বৃন্দাবনে যাওয়ার কারণ কি?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ—

১। যার নাম——দিন নাহি কাটে।

কবিতাংশটি কোন্ কবিতার অন্তর্ভুক্ত? কবি কে? কার—'নাম'-এর কথা এখানে উল্লিখিত হয়েছে? কবিতাংশটির প্রসঙ্গ নির্ণয় কর। উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটিকে সবাই ভয় করত কেন? এখন সবাই তার শতবার নাম করে কেন তার বিবরণ দাও।

(খ) একদা তাহার——রস ক্ষরে।

কার সকল অঙ্গ কি উদ্দেশ্যে নিবেদিত হ'ল? পংক্তি দুইটির প্রসঙ্গ নির্ণয় কর। 'দারুভূত' শব্দটির অর্থ বল। 'পলে পলে রস ক্ষরে'—বাক্যাংশটির অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্‌ঘাটন কর।

বাক্যে প্রয়োগ কর ঃ—

টাকার কুমীর, কঞ্জুষ, সুদ, টেনা, নামাবলি, দুর্গম, কানন।



[শিশু-সাহিত্যের অমর শিল্পী কবি সুনির্মল বসু ১৯০২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন 'সন্দেশ' গোষ্ঠীভুক্ত লেখক। তাঁর রচিত 'কানাকড়ির প্রতিভা' 'বুদ্ধভূতুম', 'ভেল্কীবাজী', 'পবিত্তির মাসীমা', 'কাশির টোটকা' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। তাঁর রচিত 'রাজা রামমোহন,' 'মাইকেল মধুসূদন,' 'শ্রীরামকৃষ্ণ' ও 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' প্রভৃতি জীবনীমূলক রচনা শিশুদের পক্ষে খুব বেশী উপযোগী।]

আকাশ আমায় শিক্ষা দিল
উদার হতে ভাই রে ;
কর্মী হবার মন্ত্র আমি
বায়ুর কাছে পাই রে।
পাহাড় শিখায় তাহার সমান
হই যেন ভাই মৌন-মহান,
খোলা মাঠের উপদেশে
দিল্‌ খোলা হই ভাই রে।

সূর্য আমায় মন্ত্রণা দেয়
আপন তেজে জ্বলতে,
চাঁদ শিখালো হাসতে মোহর
মধুর কথা বলতে।

ইঙ্গিতে তার শিখায় সাগর,
অন্তর হোক রত্ন-আকর,
নদীর কাছে শিক্ষা পেলাম
আপন বেগে চলতে।

মাটির কাছে সহিষ্ণুতা
পেলাম আমি শিক্ষা,
আপন কাজে কঠোর হতে
পাষাণ দিল দীক্ষা।
ঝরণা তাহার সহজ গানে
গান জাগালো আমার প্রাণে,
শ্যাম বনানী সরসতা
আমায় দিল ভিক্ষা।

বিশ্ব-জোড়া পাঠশালা মোর,
সবার আমি ছাত্র ;
নানান্ ভাবের নতুন জিনিস
শিখছি দিবারাত্র ;
এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়,
পাঠ্য যে-সব পাতায় পাতায়—
শিখছি সে-সব কৌতূহল
সন্দেহ নাই মাত্র।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন ঃ—

১। 'সবার আমি ছাত্র' কবিতার সারাংশ লেখ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ—

১। (ক) আকাশ, বায়ু, পাহাড়, মাঠ প্রভৃতি কবিকে কি শিক্ষা দিয়েছে ?

(খ) সূর্য, চাঁদ, সাগর ও নদী তাঁকে কি শিক্ষা দিয়েছে ?

(গ) মাটি, পাষাণ, ঝর্ণা, ও বনানী তাঁকে কি শিক্ষা দিয়েছে ?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ—

১। (ক) বিশ্বজোড়া পাঠশালা—— দিবারাত্র।

কোন্ রচনা থেকে উদ্ধৃত ? রচয়িতা কে ? কবি সারা বিশ্বকে পাঠশালা রূপে দেখেছেন কেন ? তিনি 'দিবারাত্র' ধরে কি কি বিষয় শিক্ষা নিচ্ছেন।

(খ) এই পৃথিবীর———সন্দেহ নাই মাত্র।

—প্রসঙ্গটি বর্ণনা কর। কবি কৌতূহল ভরে এই পৃথিবীর খাতা থেকে কি কি পাঠ্য গ্রহণ করেছেন তা বল।

বন্ধনীর মাঝ থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে পূর্ণ বাক্য গঠন কর ঃ—

১। (ক) আকাশের রঙ (কালো/সাদা/নীল)। (খ) বায়ুকে চোখে দেখা যায় (হাঁ/না)। (গ) পাহাড়ের শরীর (নরম/মধুর/কঠিন)। (ঘ) চাঁদের দেখা মিলে (শুক্লপক্ষে/কৃষ্ণপক্ষে)। (ঙ) সাগর বয়ে চলে (পার্বত্য ভূমিতে/ মরুভূমিতে/সমতল ভূমিতে)।

পদান্তর কর ঃ—

শিক্ষা, উদার, বায়ু, পাহাড়, চাঁদ, মাটি, সহিষ্ণুতা, কঠোর, সরসতা।



কবি পরিচিতি ঃ কবি জসীমউদ্দীন (১৯০৩-১৯৭৬) বিংশ শতাব্দীর বাঙালী মুসলমান কবিদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'নক্সী কাঁথার মাঠ', 'রাখালী', 'বালুচর', 'ধানক্ষেত' ইত্যাদি।

["রাখাল ছেলে" কবিতাটিতে গাঁয়ের রাখাল ছেলের সঙ্গে পল্লীটি প্রকৃতির নিবিড় যোগাযোগের কথা কবি অপরূপ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। এখানে মানুষ ও প্রকৃতি পাশাপাশি দুটি প্রাণসত্তার মত বেড়ে উঠেছে।]

"রাখাল ছেলে, রাখাল ছেলে, বারেক ফিরে চাও,
বাঁকা গাঁয়ের পথটি বেয়ে কোথায় চ'লে যাও ?"
"ওই যে দেখ নীল-নোয়ানো সবুজ-ঘেরা গাঁ,
কলার পাতা দোলায় চামর, শিশির ধোয়ায় পা !
সেথায় আছে ছোট্ট কুটীর সোনার পাতায় ছাওয়া,
সাঁঝ আকাশের ছড়িয়ে-পড়া আধার-রঙে নাওয়া ;
সেই ঘরেতে একলা ব'সে ডাকছে আমার মা—
সেথায় যাব, ও ভাই এবার আমায় ছাড় না।"
"রাখাল ছেলে, রাখাল ছেলে, আবার কোথা ধাও,
পূব-আকাশে ছাড়ল সবে রঙান মেঘের নাও।"
"ঘুম হতে আজ জেগেই দেখি শিশির-ঝরা ঘাসে
সারা রাতের স্বপন আমার মিঠেল রোদে হাসে।
আমার সাথে করতে খেলা প্রভাত-হাওয়া, ভাই,
সরষে ফুলের পাপড়ি নাড়ি ডাকছে মোরে তাই.
চলতে পথে মটরশুঁটি জড়িয়ে দু'খান পা—
বলছে যেন, 'গাঁয়ের রাখাল একটু খেলে যা'।

সারা মাঠের ডাক এসেছে—খেলতে হবে, ভাই,
সাঁঝের বেলা কইব কথা, এখন তবে যাই !"
"রাখাল ছেলে, রাখাল ছেলে সারাটি দিন খেলা—
এ যে বড় বাড়াবাড়ি, কাজ আছে যে মেলা ।"
"কাজের কথা জানিনে ভাই, লাঙল দিয়ে খেলি
নিড়িয়ে দেই ধানের ক্ষেতের সবুজ রঙের চেলী ।
ঝাউ-এর ঝাড়ে বাজায় বাঁশী পউষ পাগল বুড়ী,—
আমরা সেথা চষ্‌তে লাঙল মুর্শীদা-গান জুড়ি ।
খেলা মোদের গান-গাওয়া ভাই ; খেলা লাঙল-চষা,
সারাটি দিন খেলতে পারি, জানিইনেকো বসা ।"

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন :—

১। রাখাল ছেলে সারাদিন কিভাবে খেলা করে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। "কাজের কথা জানিনে ভাই, লাঙ্গল দিয়ে খেলি।"—রাখাল ছেলের একথার অর্থ বুঝিয়ে দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :—

১। "সেথায় আছে ছোট্ট কুটীর"—ছোট্ট কুটীরটি কার ? তার ছোট্ট কুটিরটি কোথায় অবস্থিত ? সেখানে আর কে থাকে ?

২। "সাঁঝের বেলা কইব কথা—এখন তবে যাই।"—বক্তব্যটি কার ? সে কাকে একথা বলছে ? বক্তার এই কথার আগে সে কি আহ্বান জানিয়েছিল ?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :—

১। আমার সাথে——ডাকছে মোরে তাই।

পংক্তি কয়টি কোন্ কবিতার ? কবির নাম কি ? প্রসঙ্গটি নির্ণয় কর। 'সরষে ফুলের পাপড়ি নাড়ি'—বাক্যাংশটির মর্মার্থ লিপিবদ্ধ কর।

(খ) খেলা মোদের ·····জানিইনেকো বসা।

'মোদের'—কথাটি কাদের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়েছে ? কবিতাংশটির প্রসঙ্গ নির্ণয় কর। তাদের খেলার বিষয় কি কি ? 'জানিইনেকো বসা'—কথাটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।

টীকা লেখ :—

আবীর-রঙে নাওয়া, সারা রাতের স্বপন আমার মিঠেল রোদে হাসে, সবুজ রঙের চেলী, পৌষ পাগল বুড়ি, মুর্শীদা গান।

পদান্তর কর :

পথ, মিঠেল, প্রভাত, মাঠ, দিন, খেলা।



[বুদ্ধদেব বসু ১৯০৮ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কল্লোল গোষ্ঠীর এক বিশিষ্ট লেখক। 'কবিতা' পত্রিকা পরিচালনা করে তিনি আধুনিক সাহিত্য আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। গল্প, নাটক, উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচনা করলেও কবি হিসেবে তাঁর খ্যাতি সুদূরপ্রসারী। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ—'বন্দীর বন্দনা', 'কঙ্কাবতী', 'দ্রৌপদীর শাড়ি', 'শীতের প্রার্থনা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৪ সালে কলকাতায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।]

সকাল থেকেই বৃষ্টির পালা শুরু,
আকাশ-হারানো আঁধার জড়ানো দিন।
আজকেই, যেন শ্রাবণ করেছে পণ,
শোধ করে দেবে বৈশাখীর সব ঋণ।
রিমঝিম ঝরে অঝোরে অন্ধ ধারা,
ঘনবর্ষণে আপাত-আত্মহারা
পৃথিবীতে যেন দিন নেই, রাত নেই ;
স্তম্ভিত কালো মেঘ—মায়ালোকে লীন।

পথের পাথরে উঠছে জলের ধোঁয়া,
উঁচু গাছগুলি মাথা নীচু করে চুপ ;

বস্তুগলিত তর লত এই দিনে
সেই—ভালো 'হয়', সব যদি যায় খোওয়া।
তবু ন-টা বাজে তবু ছাতা হাতে নিয়ে
ট্রামে চড়ে বসি অফিসের অভিসারে,
কেরানিকীর্ণ খাঁচার রন্ধ্র দিয়ে
থেকে-থেকে লাগে সিক্ত কোমল ছোঁওয়া।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন ঃ—

১। কবিতাটি অবলম্বন করে বর্ষার একটি চিত্র অঙ্কন কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ—

১। 'শ্রাবণ করেছে পণ'—'শ্রাবণ' কোন্ ঋতুর অন্তর্গত? সে কি 'পণ' করেছে? শ্রাবণের রূপ বর্ণনা কর।

২। 'ট্রামে চড়ে বসি অফিসের অভিসারে'। —কে ট্রামে চড়ে বসেন এবং কখন? সঙ্গে তাঁর কি থাকে? 'অফিসের অভিসারে'—কথাটির ব্যাখ্যা দাও।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ—

১। (ক) ঝিমঝিম ঝরে——মায়ালোকে লীন।

উদ্ধৃতিটি কোন্ কবিতার অন্তর্গত? কবি কে? 'ঝিমঝিম ঝরে'—কোন্ মাসে? 'আপাত-আত্মহারা'—বাক্যাংশটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও। 'স্তম্ভিত কালো মেঘ—মায়ালোকে লীন'—পংক্তিটির সরল অর্থ বল।

(খ) তবু ন-টা বাজে——কোমল ছোঁওয়া।

—বক্তা কে? ন'-টায় তিনি কোথা রওনা হন? কবিতাংশটির প্রসঙ্গ নির্ণয় কর। 'অফিসের অভিসারে'—কথাটির ব্যাখ্যা দাও। 'কেরানিকীর্ণ খাঁচার রন্ধ্র'—কথাটি উল্লেখের তাৎপর্য কি? 'থেকে থেকে সিক্ত কোমল ছোঁওয়া'—লাইনটি সম্পর্কে তোমার অভিমত দাও।

অর্থ লেখ ঃ—

আপাত-আত্মহারা, আকাশ-হারানো, বস্তুগলিত, কেরানিকীর্ণ, অভিসার।

পদান্তর কর ঃ

শ্রাবণ, বৈশাখী, ধোঁয়া, বস্তু, কোমল।